পূর্ণ-যোগ

মূল্য আট আনা।

বিজ্ঞাপন

পূর্ণযোগ প্রবর্ত্তকে বাহির হইয়াছিল—একটু আধটু সংশোধন করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইল। পূর্ণযোগ কিন্তু অপূর্ণই রহিয়া গিয়াছে। **Original idea** ছিল তিনটি ভাগে সম্পূর্ণ করা। প্রথম ভাগ শুধু শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে পূর্ণযোগের যে মূল কথা 'বিজ্ঞান', সেই সম্বন্ধে লিখিবার এবং তৃতীয় ভাগে পূর্ণযোগের সাধনা অর্থাৎ **Practical indications** দিবার ইচ্ছা আছে।

গ্রন্থকার

২০এ ভাদ্র, ১৩২৫

পূর্ণ-যোগ

১

যোগের উদ্দেশ্য

মানুষে ভগবানের স্পর্শ—ইহারই নাম যোগ। এখানে ভগবান্ অর্থে আমরা যাহাই বুঝি না কেন তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। মানুষ হইতে উচ্চতর বৃহত্তর বিশ্বজনীন অথবা তুরীয় একটা কিছু জাগ্রত সত্তা এইটুকু স্বীকার করিয়া আরম্ভ করিলেই যথেষ্ট। ভক্তের সহিত ভগবানের, অহংএর সহিত ঈশ্বরের, জীবের সহিত শিবের, আত্মার সহিত পরমাত্মার—এমন কি বৌদ্ধমত অনুসরণ করিয়া সংস্কারের সহিত শূন্যের—আমরা সেই একই সংযোগের কথা বলিতে পারি। মূল কথা এই সংযোগ,

এই সম্বন্ধ স্থাপন, উহা হইতেই যোগসাধন আরম্ভ। কিন্তু এই সাধনার প্রণালী, গতি, পরিণতি সব নির্ভর করে মানুষ আপনার কোন্ ভাগে কোন্ ক্ষেত্রে ভগবানের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে বা হইতে চাহিতেছে, তাহার কোন্ অঙ্গে ভগবানের স্পর্শ পড়িয়াছে।

কারণ মানুষ বিশুদ্ধ অমিশ্র অখণ্ড একটি বস্তু নয়। সে বিভিন্ন ও বিপরীত গুণাবলীর সমষ্টি, প্রকৃতির সকল স্তর তাহার মধ্যে গ্রথিত, সৃষ্টির সকল স্রোতই তাহার মধ্যে বহমান। আমরা স্পষ্টই লক্ষ্য করিতে পারি প্রধানতঃ তিনটি স্তর একটির উপরে আর একটি সেখানে বিন্যস্ত রহিয়াছে। প্রথম দেহ আর দেহকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে যে জীবনীশক্তি বা প্রাণশক্তি। দ্বিতীয় মন—বুদ্ধি বিচার চিন্তা ভাবুকতা প্রভৃতির খেলা এই উর্দ্ধতর ক্ষেত্রে। তৃতীয় ও উর্দ্ধতম ক্ষেত্র হইতেছে অধ্যাত্মবোধ যাহার স্বরূপ বিজ্ঞানময়, আনন্দময়—যাহা অমৃতত্বের অধিষ্ঠান। বর্ত্তমানে মানবপ্রকৃতি এখনও এই আত্মাকে সজ্ঞানে চিনিতে পারে নাই, সে তাহার মনের খেলার মধ্য দিয়াই আভাসে ইঙ্গিতে ইহাকে বোধ করিতেছে। কিন্তু উহাই সৃষ্টির চরম লক্ষ্য। দেহ ও প্রাণ লইয়া মানুষের পশুভাব, মন বুদ্ধি লইয়া মানুষের মানুষভাব আর তুরীয় জ্ঞান আনন্দ লইয়া মানুষের দেবভাব, সিদ্ধভাব বা ভাগবতভাব। বিবর্ত্তনের গতি চলিয়াছে পশুভাব হইতে মানুষভাবে, মানুষভাব হইতে দেবভাবে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে। মানুষের মধ্যে যে শক্তি চায় মানুষকে পশুভাব মানুষ-

ভাব হইতে দেবভাবে তুলিয়া ধরিতে তাহারই নাম যোগশক্তি এবং সেজন্য যে পথে চলিতে হয়, জীবনকে গড়িতে হয় চালাইতে হয় তাহারই নাম যোগসাধনা।

ভারতবর্ষে যে নানা সাধনপন্থা প্রচলিত আছে তাহাও মানুষের এই ত্রিধা ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে স্তরে স্তরেই সজ্জিত। প্রথম হঠযোগ। হঠযোগের ক্ষেত্র মানুষের সর্ব্বনিম্ন স্তর—তাহার স্থূলদেহ। শরীর ও প্রাণশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া উহার মধ্যেই ভগবানের স্পর্শ অনুভব করা হঠযোগের উদ্দেশ্য। তারপর রাজযোগ মানুষের দ্বিতীয় স্তরের উপর স্থাপিত। সমস্ত মনটি, মনের কোন বিশেষ বৃত্তি বা খেলা নয় কিন্তু মনের যে মূলপ্রকৃতি সেই মানসসত্তা অথবা চিত্ত দ্বারাই রাজযোগ মানুষকে সাধনমার্গে নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত করিতেছে। রাজযোগ কেন্দ্রীভূত মানুষের সূক্ষ্মদেহে। সর্ব্বশেষে মানুষের আধ্যাত্মিক বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই মার্গত্রয় —(১) জ্ঞানযোগ (২) ভক্তিযোগ (৩) কর্ম্মযোগ। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মপ্রেরণা (ইচ্ছাশক্তি will) মনের এই তিনটি প্রকরণ। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ যথাক্রমে এই তিনটির একটির উপর নির্ভর করিয়া উহার সাহায্যে মানুষকে ভাগবতসত্তায় পরিণত করিতে চায়। মার্গত্রয়ীর কেন্দ্র মানুষের স্থূল দেহও নয়, সূক্ষ্ম দেহও নয়, তাহা হইতেছে আত্মা, জীব বা পুরুষ। জ্ঞান প্রেম অথবা শক্তির মধ্য দিয়া আত্মার সহিত পরমাত্মার, জীবের সহিত ভগবানের, পুরুষের সহিত পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপনই ত্রিমার্গের অধ্যাত্মযোগ।

এই ভিন্ন ভিন্ন সাধনপন্থার সার্থকতা কি, অভাব কি, গুণ কি, দোষই বা কি তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন সাধনার উদ্দেশ্য কি, যোগের লক্ষ্য কি? কারণ একমাত্র উদ্দেশ্য দ্বারাই উপায়ের সফলতা বা নিষ্ফলতা বিচার সম্ভব। কোন্ সাধনমার্গের উপযোগিতা কোথায়, অনুপযোগিতা কোথায় তাহা স্থির করিতে হইবে কি লক্ষ্য করিয়া আমরা সাধনা করিতে চলিয়াছি। যোগসাধনার দুইটি লক্ষ্য আমাদের সম্মুখে —কৈবল্যমুক্তি আর জীবন্মুক্তি। মায়াবাদীগণের মত জগৎকে যদি শুধু মরীচিকা শুধু দুঃস্বপ্ন বলিয়া জানি, বৌদ্ধদিগের মত মানুষকে, সৃষ্টিকে যদি 'ক্ষণিক বেদনা'-সমষ্টিরূপেই গ্রহণ করি তবে জগতে থাকিতে আমরা চাহিব না—কোনরূপে এই দুঃস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতে পারিলেই আমাদের নিঃশ্রেয়স, দীপশিখার মত কোনরূপে নির্ব্বাপিত হইয়া যাওয়াই পরম পুরুষার্থ। জীবনকে মুছিয়া দিয়া, জগতের সহিত সকল সম্পর্ক শূন্য হইয়া উহাদের অতীতে কোন কিছুতে অথবা কিছু-না'র মধ্যে মিশিয়া মিলাইয়া যাওয়াই কৈবল্যমুক্তি। ইহাই যদি আমাদের সাধনার লক্ষ্য হয় তবে এই যে ভিন্ন ভিন্ন সাধনপন্থা তাহাদের পরস্পরের তুলনা বা দোষগুণ বিচার করা উহাদের সমন্বয়ের চেষ্টা করা বিশেষ প্রয়োজন হয় না। যে পন্থাই নির্ব্বাচন কর না কেন, একবার নির্ব্বাচিত করিয়া সেই পন্থা ধরিয়া বরাবর চলিয়া গেলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। উপরে উঠিয়া যাওয়াই যখন একমাত্র লক্ষ্য তখন উপায় রজ্জু হউক, বংশমঞ্চ হউক অথবা প্রস্তরের সোপান হউক তাহাতে

কি আসে যায়—কোন প্রকারে পার হইতে পারিলেই ত সব হইল। তবে একথা সত্য, ভিন্ন স্বভাব ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে কোন পন্থা কাহারও কাছে সুগম কাহারও কাছে দুর্গম। কিন্তু এইটুকু বিচার করা সাধকের পক্ষে যে বিশেষ কষ্টকর তাহা নয়।

কিন্তু জগতের অর্থ যদি আমাদের কাছে অন্যরূপ বোধ হয়, জগৎ মোহ বা দুঃস্বপ্ন নয়, জগৎ আনন্দময়, জগৎকেই যদি আমরা নিঃশ্রেয়সের আধার বলিয়া জানি, জীবনকে অস্বীকার করিয়া নয়, জীবনকে আলিঙ্গন করিয়াই যদি আমবা মুক্ত সিদ্ধ হইতে চাই তবে যোগসাধনার এক সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তি আমাদের চক্ষে ফুটিয়া উঠে। মানুষরূপ যে মন্দির তাহাব দেবতা মন্দিরের চূড়ায় যে কেবল অধিষ্ঠিত তাহা নয়, এই মন্দিব যে সেই চূড়ায় উঠিবার জন্য শুধু সোপানাবলীর সমষ্টি তাহা নয়। ইহার মধ্যে যতগুলি প্রকোষ্ঠ আছে সবগুলিই দেবতার প্রতিষ্ঠান, দেবতার নিবাসধাম —সকলগুলি যুগপৎ পরিষ্কৃত, পরিমার্জ্জিত রাখিতে হইবে, সকল-গুলির মধ্যেই যুগপৎ যজ্ঞকুণ্ড প্রজ্বলিত বাখিতে হইবে। শরীরের অতীত হইবার জন্যই শুধু শবীর নয়, মনের অতীত হইবার জন্যই শুধু মন নয়, জ্ঞান প্রেম কর্ম্মের অতীত হইবার জন্যই শুধু জ্ঞান প্রেম কর্ম্ম নয়, ব্যক্তিত্বকে বিনষ্ট করিবার জন্যই শুধু ব্যক্তিত্ব নয়। দেহ মন আর অধ্যাত্ম বৃত্তি ভগবানকে পাইবার যে কেবল পন্থা বা উপায়মাত্র তাহা নহে। আমরা যখন বুঝিতে পারি শরীরের পশ্চাতে কেবল যে ভগবান্ তাহা নহে শরীরই ভগবান্, মনের পশ্চাতে শুধু নহে মনই ভগবান্, অধ্যাত্মসত্তার পশ্চাতে শুধু

নহে অধ্যাত্মসত্তাই ভগবান্ তখন সকল প্রকার সাধনপন্থারই এক-যোগে আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করি। শরীর মন আত্মা এই তিনটি স্তরেই আমরা প্রতিষ্ঠিত থাকিব, মানুষের সমগ্রটির মধ্যে ভগবানকে জাগাইয়া তুলিব, আমাদের কোন একটিমাত্র অঙ্গে নয়, আমাদের যাহা কিছু আছে সকল অঙ্গদ্বারাই ভগবানকে আলিঙ্গন করিব—ইহাই যদি আমাদের যোগের লক্ষ্য তবে শুধু একটি কোন বিশেষ পন্থাই আমাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। আমরা চাই অখণ্ড পূর্ণযোগ যাহা দ্বারা আমাদের সকল স্রোতধারায় ভগবান্ কূলে কূলে ভরিয়া উঠিতে পারেন, আমাদের সকল ক্ষেত্রকেই ফলে ফুলে ফসলে ঋদ্ধিমান করিয়া তুলিতে পারেন। আরও, আমরা শুধু ব্যক্তিগত সিদ্ধি চাহি না, আমরা চাহি বিশ্বমানবেরই সিদ্ধি। বিশ্বমানব যাহাতে শুদ্ধ, মুক্ত, পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে আমাদের ব্যক্তিগত সাধনা তাহারই প্রতিকৃতি। মানবসঙ্ঘের নির্ব্বাণ আমরা চাহি না, আমরা চাহি যাহাতে সে তাহার অশেষ বৈচিত্র্য লইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে। তাহার বর্ত্তমান সকল প্রেরণা সকল প্রয়াস সকল কর্ম্মই থাকিবে শুধু তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে একটা উচ্চতর কিছুর মধ্যে—ভগবানের মধ্যে। ইহা যখন আমাদের উদ্দেশ্য তখন কোন একটি মাত্র বিশেষ সাধনমন্ত্র কিছু সমগ্র মানবজাতির ভিন্নমুখী প্রচেষ্টার উপর চাপাইতে পারি না। তাই আমাদের সকল পন্থার সমন্বয় বাহির করা প্রয়োজন, এমন সমন্বয় যাহা শুধু আমাদের নিজের নিজের নয় কিন্তু নিখিল জীবের মানবজাতির সমষ্টিগত সাধনার পক্ষেই প্রযোজ্য হইতে পারে।

এই পূর্ণাঙ্গ যোগই যখন আমাদের লক্ষ্য তখন এই লক্ষ্যটিকে সম্মুখে রাখিয়া, উহার সাহায্যেই স্থির করিতে হইবে কোন্ যোগ-পন্থার কতটুকু সার্থকতা, কতটুকুই বা ত্রুটি। তাহার পূর্ব্বে এই বিভিন্ন পন্থার কিছু ব্যাখ্যা, কাহার কি বিশেষ ফল তাহা নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন।

২

হঠযোগ

প্রকৃতির প্রতিষ্ঠাভূমি যে অন্নময় ও প্রাণময় কোষ, সহজ ভাষায় যাহার নাম দেহ ও প্রাণ, তাহাকে পরিশুদ্ধ বশীভূত করাই হঠ-যোগের লক্ষ্য। সাধারণ জীবনে মানুষের দেহ ও প্রাণ গঠিত হই-যাছে সেই সাধারণ জীবনের প্রয়োজন হিসাবে। প্রকৃতির বিরাট ভাণ্ডার হইতে একটি ক্ষুদ্র ক্ষীণ ধারা মাত্রকেই আশ্রয় করিয়া আমাদের এই দেহ ও প্রাণ। বংশানুক্রমের ধারা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ধারা এই দুইটির দ্বারা আমাদের শরীর ও প্রাণের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত খণ্ডিত। শরীর সেই সেই অঙ্গ ততটুকুমাত্র সঞ্চালন করে, প্রাণে শুধু সেই পরিমাণে শক্তিব খেলা হয় যাহা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মজীবনের পক্ষে প্রযোজন ও পর্য্যাপ্ত, তাহার অধিক কিছু নয়। প্রকৃতি সাধারণ মানুষের শরীর ও প্রাণে যে ধর্ম্ম যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে হঠযোগ তাহা অতিক্রম করিয়া আর একটি বৃহত্তর ধর্ম্ম আর একটি পূর্ণতর সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চায়।

শরীর শীতোষ্ণ ক্ষুৎপিপাসা রোগ জরা মৃত্যুর দাস, তাহার চির অভ্যাসগত কর্ম্মগুলিরই মধ্যে সে আবদ্ধ, প্রাণে ততটুকু বেগ যতটুকুর জোরে শরীর তাহার আয়ুর বর্ষ শতেকের পারে যাইয়া পৌঁছিতে পারে। হঠযোগী চায় প্রাণের মধ্যে এমন একটি উৎস খুলিয়া দিতে যাহার সাহায্যে প্রকৃতির অজস্র অফুরন্ত প্রাণশক্তি তাহার ভিতরে বিপুল স্রোতে বহিয়া আসিতে পারে, শরীরের সকল ক্ষুদ্র বন্ধন, যাবতীয় খণ্ডিত সংস্কার ভাসিয়া যাইতে পারে। শরীর ও প্রাণকে সাধারণ জীবনের প্রয়োজনের শুধু উপযুক্ত করিয়াই রাখিতে চায় না। শরীর সুস্থভাবে অনিশ্চিত কাল ব্যাপিয়া থাকিবে, প্রকৃতির অনন্ত জীবনী-শক্তি ধারণ করিবার সামর্থ্য উহাতে থাকিবে।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হঠযোগী দুইটি উপায় লইয়াছে—আসন ও প্রাণায়াম। আসনের দ্বারা শরীরকে অচঞ্চল স্থির হইতে শিক্ষা দেওয়া হয়। সাধারণতঃ শরীর নিতান্ত অস্থির, একটা কিছু না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহার কারণ প্রকৃতির প্রাণশক্তির বিরাট সমুদ্র হইতে যে স্রোত শরীরের মধ্যে সর্ব্বদা আসিয়া পড়িতেছে শরীর তাহার সব কিছু ধারণ করিতে পারে না, তাই বিবিধ অঙ্গসঞ্চালনীর মধ্য দিয়া উহা বাহিরে উপছিয়া পড়ে, নানা কর্ম্মাবলী দ্বারা অতিরিক্ত শক্তিটুকু ক্ষয় করিতে আমরা বাধ্য হই। শরীরকে শান্ত নিস্পন্দ করা অর্থ এই প্রাণশক্তি সবটুকু নিজের মধ্য ধারণ করা। প্রাণশক্তি যদি এইরূপ শরীরের মধ্যে জমাইয়া তুলিতে পারি তাহার ফলে শরীর বলীয়ান, স্বাস্থ্যপূর্ণ কমনীয়

হইয়া উঠে। হঠযোগী তারপর নানা প্রকার জটিল প্রক্রিয়া দ্বারা শরীর হইতে সকল ময়লা দূর করেন ও নাড়ীমণ্ডলী পরিশুদ্ধ রাখেন। নাড়ী শুদ্ধির উদ্দেশ্য নিশ্বাস প্রশ্বাসের অবাধ খেলা। এই নিশ্বাস প্রশ্বাস লইয়া যে প্রক্রিয়া তাহারই নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়াম অর্থ প্রাণশক্তিকে, প্রাণবায়ুকে সংযত স্ববশীভূত করা। আর নিশ্বাস প্রশ্বাসই হইতেছে প্রাণশক্তির প্রধান স্থূল ক্রিয়া। প্রাণায়ামের দুইটি উদ্দেশ্য। প্রথম আসনের দ্বারা যে কায়াসিদ্ধি হয় তাহাকে আরও পূর্ণতর করা। প্রাণায়ামের ফলে শরীরে প্রাণশক্তি মুক্তভাবে খেলিতে পারে ও সে শক্তির বেগও অনেক বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ শরীর যে সকল নিয়মের দাস সে সকল সে অতিক্রম করিতে পারে। প্রাণশক্তিকে স্ববশে আনিয়া শরীরের দ্বারা যে নানা প্রকার অদ্ভুত কর্ম্ম করা যাইতে পারে—ইহা হঠযোগশাস্ত্রে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া চিরদিন ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। শরীর স্বাস্থ্যে, বীর্য্যে, সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠে এবং হঠযোগীরা বিশ্বাস করেন তাঁহারা বহুকাল এমন কি অনির্দ্দিষ্ট কাল ধরিয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন। প্রাণায়ামের আর এক ফল উহা সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া সাধারণ মানুষের অলভ্য অপরিচিত নানা প্রকার নূতন বৃত্তি খুলিয়া দেয়—সাধকের মধ্যে উদ্ভাসিত হয় সৃষ্টির অদৃশ্য স্তর, অকল্পিত জগৎ, অদ্ভুত দৃষ্টি, অদ্ভুত শক্তি। শুধু তাহাই নয় মানুষের যে সকল সাধারণ বৃত্তি উহাদেরও পরিস্ফুরণ হয়, উহারাও বিপুল শক্তির আধার হইয়া কার্য্যকরী হয়। এই সকল ঐশ্বর্য্য সিদ্ধির জন্য হঠযোগী আরও নানা

প্রকার গৌণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া থাকেন।

হঠযোগের ফল যাহা তাহা আমরা দেখিলাম। সাধারণ মানুষ এই সকলের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হইবে ইহা কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু প্রশ্ন এই এ সকলের সার্থকতা কি? শরীর না হয় অক্ষয় হইল, অসাধারণ শক্তির আধার হইল কিন্তু মানুষ কেবল ঐটুকুতেই তৃপ্ত হইতে পারে কি? মৈত্রেয়ীর বিখ্যাত কথায়, শুধু বিত্ত আহরণ করিয়া লাভ কি—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্?

হঠযোগের এইখানেই মস্ত অভাব। ভগবানকে, অমৃতকে সে অতি সহজেই ভুলিয়া যায়। যোগের যে মুখ্য কথা ভগবানের মধ্যে মুক্ত সিদ্ধ হওয়া হঠযোগী সেটুকু মনে রাখিতে পারেন না, ঐশ্বর্য্যের মোহে তিনি আবদ্ধ হইয়া পড়েন। সেই জন্যই সচরাচর প্রকৃত যোগীদিগের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের প্রতি, 'সিদ্ধাই'র প্রতি কেমন একটা সঙ্কোচ, অথবা ভীতি রহিয়াছে আমরা দেখিতে পাই। তাঁহারা বলেন এ সকল ভূত প্রেতের খেলা অথবা পথের প্রলোভন —এ সকল হইতে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল। সাধকের মধ্যে এইরূপ কোন ঐশ্বর্য্যের সঞ্চার হইলে উহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে তাঁহারা উপদেশ দেন। কিন্তু ইহাও আবার অতি মাত্রা। আমরা ঐশ্বর্য্যও চাহি কিন্তু তাহা হইবে ভগবানের ঐশ্বর্য্য। ভগবৎ উপলব্ধি ও ঐশ্বর্য্য যে যুগপৎ থাকিতে পারে না তাহা নয়। হঠযোগীর ভুল এইখানে তিনি যে শক্তির অধিকারী ভগবানকে বিস্মরণ করিয়া তাহা কৃপণের মত নিজের জন্য নিজের মধ্যে লুকা-

হইয়া রাখেন। আমরা যে পূর্ণযোগের কথা বলিয়াছি তাহা জগৎ লইয়া মনুষ্যজাতি লইয়া। আমাদের যোগের ফল বিশ্ববাসীর কল্যাণে জগতের কর্ম্মে নিয়োজিত হইবে। অন্যান্য যোগীদিগের ন্যায় ঐশ্বর্য্য আমরা বর্জ্জন করিতে চাহি না কিন্তু হঠযোগীর মতনও আবার উহাকেই একান্ত করিয়া ধরিব না। তারপর আমাদের যোগের লক্ষ্য জগতের সহিত সকল প্রকার জাগ্রত সম্বন্ধে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া। কিন্তু হঠযোগী যে বিরাট জটিল প্রক্রিয়াদিতে মগ্ন তাহা তাঁহার সমস্ত শক্তি ও সময়কে নিয়োজিত রাখে—বাধ্য হইয়া তাঁহাকে জগতের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হয়। অধিকন্তু হঠযোগী ভীষণ কৃচ্ছ্র সাধনার পর যে সকল ফলের অধিকারী হয়েন তাহা যে কেবল হঠযোগের দ্বারাই লভ্য এমন নহে। রাজযোগের দ্বারা তান্ত্রিক সাধনার দ্বারা সেই সকল ফল অনেক সহজে আমরা পাইতে পারি। হঠযোগের দান অনেকখানি সন্দেহ নাই কিন্তু সেজন্য যে পরিমাণ মূল্য সে আদায় করে তাহা নিতান্তই বিসদৃশ। সেই একই মূল্য দিয়া আমরা সেই সমস্ত জিনিষ ও আরও মহত্তর জিনিষ সব পাইতে পারি।

৩

রাজযোগ

হঠযোগের একস্তর উপরে হইতেছে রাজযোগ। আমরা বলিয়াছি এই রাজযোগ শরীর বা প্রাণ লইয়া নয়, ইহার কেন্দ্র মন। মনকে

বশীভূত করিয়া উহার সাহায্যে মানুষকে পরিবর্ত্তিত, ভাগবত সত্তায় অধিষ্ঠিত করিতে সে চাহে। মনকে শুদ্ধ, সংযত, শান্ত করিতে হইবে অর্থাৎ সমস্ত মানসিক রাজ্য—আমাদের সকল চিন্তা ভাব, বাসনা, প্রেরণাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। এখন মনের যে বিচিত্র খেলা, যে বহুমুখী বৃত্তি সে সকলের উৎস হইতেছে চিত্ত। আমরা যাহা করি, যাহা ভাবি, যাহা বোধ করি তৎ সমস্তই উঠিতেছে চিত্ত-সাগর হইতে, উহার মধ্যেই বিলীন হইতেছে, উহার মধ্যেই সংস্কাররূপে থাকিয়া যাইতেছে। মনের যে প্রতিষ্ঠা, যে মূল সেই চিত্তেরই উপর রাজযোগের দৃষ্টি। চিত্তকে যদি একবার বশ করা যায় তবে সমস্ত মন আপনা হইতেই বশে আসিবে। তাই পতঞ্জলির যোগসূত্রের প্রথম সূত্র যোগশ্চিত্ত-বৃত্তিনিরোধঃ। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করাই যোগ। মানুষের চিত্ত সর্ব্বদা শতধা চলমান। বৃত্তি সকলের উদ্দাম বিক্ষোভে মানুষের অন্তর আবিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। তাই আপনাকে সে জানিতে পারে না, আপনার মধ্যে যে বৃহত্তর মহত্তর সত্তা সেই ভগবান্ সেই পরমপুরুষের স্পর্শ পায় না। ক্ষুদ্র প্রবৃত্তি সকল ইঁহাকে স্থানচ্যুত করিয়া বিতাড়িত করিয়াছে—ভৃত্য প্রভুর আসনে বসিয়া রাজ্য চালাইতেছে। এই চিত্তবৃত্তিকে আনত শান্ত করিবার জন্য রাজযোগী অষ্টাঙ্গ সাধনার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই অষ্টাঙ্গ হইতেছে যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান ও সমাধি। প্রথম যম ও নিয়ম। মনের চিত্তের যে অতিমাত্র চাঞ্চল্য, প্রবৃত্তির যে উচ্ছৃঙ্খল বেগ তাহাকে কিয়ৎ পরিমাণে

খর্ব্ব করিয়া আনা যম ও নিয়মের লক্ষ্য। অহিংসা, সত্যভাষণ, মিতাচার, শুচি, সন্তুষ্টি, ঈশ্বর-চিন্তা প্রভৃতি বিধিনিষেধের মধ্যে থাকিয়া সাধক চিত্তবিক্ষোভের দাসত্ব হইতে অনেকখানি মুক্তিলাভ করেন। মনকে সংযত নিয়মগত করিয়া ক্রমে ক্রমে স্থির শান্ত হইতে শিক্ষা দেন। কিন্তু মনকে শান্ত করা কেবল মনের দ্বারাই হয় না। মনের উপর শরীর এবং প্রাণেরও অনেকখানি আধিপত্য রহিয়াছে। রাজযোগ তাই আসন এবং প্রাণায়ামেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে হঠযোগী যে কৃচ্ছ্রসাধ্য শতাধিক আসন, যে বহুবিধ জটিল প্রাণায়াম ক্রিয়ার সাহায্য লইয়াছেন, রাজযোগী সে সকলকে সহজ সরল করিয়া যতটুকু প্রয়োজন মাত্র সেইটুকু গ্রহণ করিয়াছেন। স্থিরসুখ আসনই একমাত্র আসন অর্থাৎ যেরূপে বসিলে মন স্থির করিবার সুবিধা হয়, প্রাণায়াম সহজ হয় তাহাই আসন। প্রাণায়াম হইতেছে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ। এই শ্বাস প্রশ্বাস রোধের দুইটি উদ্দেশ্য। প্রথম শ্বাস প্রশ্বাস রোধের সহিত চিত্তবৃত্তির রোধও সহজ হইয়া আইসে। দ্বিতীয় শ্বাস প্রশ্বাসের খেলাকে স্ববশীভূত করা অর্থ প্রাণবায়ুকে নিজের মধ্যে ধরিয়া রাখা, তাহাকে অধিগত করা। ইহাতে প্রাণশক্তির আধার যে সুপ্ত কুণ্ডলিনী তাহা জাগরিত হয়, চিত্তের উপর যে তমঃ যে ঘন আবরণ পড়িয়া আছে তাহা দূরীকৃত হয়, চিত্ত স্বচ্ছ সত্ত্বপ্রকাশক হইয়া উঠে। চিত্তকে সত্ত্বপূর্ণ প্রকাশক করিয়া তুলিতে হইবে ইহা আসন ও প্রাণায়ামের একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্যসাধনের অতিরিক্ত বা অবান্তর যে প্রক্রিয়াদি রাজযোগ সে সকল পরিত্যাগ

করিয়াছেন। আরও, প্রাণায়ামের দ্বারা সাধক যে সকল ঐশ্বর্য্য, যে সকল অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া থাকে রাজযোগী হঠযোগীর ন্যায় তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট বা আসক্ত নহেন।

চিত্ত যখন বিমল শান্ত হইয়াছে, প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিয়াছে তখন তাহাকে একেবারে চিন্তাশূন্য, একেবারে নিশ্চল করিবার জন্য প্রাণায়ামের পরে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহৃত করিয়া একটি মাত্র প্রতীতি বা জ্ঞানের মধ্যে ক্রমে ক্রমে তন্ময় হইয়া যাইতে হয়। এইরূপে যথাক্রমে প্রত্যাহার ধারণা ও ধ্যানের মধ্য দিয়া সর্ব্বশেষে সেই 'তদেবার্থমাত্রনির্ভাসংস্বরূপশূণ্যমিব সমাধি'র মধ্যে পৌঁছিতে পারিলেই রাজযোগের সিদ্ধি। এই সমাধি অবস্থায় বহিঃকরণ অন্তঃকরণ সব নিশ্চেষ্ট, সব শান্ত, এখানেই সকল আত্যন্তিক নিবৃত্তি। এখানে তুমি আমি ধ্যান ধ্যেয় কিছুই নাই, আছে কেবল এক উদার মহৎ বিরাট স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্য। এই সমাধি অবস্থা যখন এরূপ পূর্ণ ও সিদ্ধ হয়, যখন চিত্তের সংস্কার সমুদয় শুধু শান্ত নয় কিন্তু একেবারে সমূলে উৎপাটিত লুপ্ত হইয়া যায়, তখনই 'দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্'।

রাজযোগ হইতে আমরা প্রধানতঃ দুইটি শিক্ষা পাই। প্রথম, সাধারণতঃ আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া স্থূলের মধ্যেই থাকি, ইন্দ্রিয়াতিগ ভূমির কোনই সংবাদ রাখি না। রাজযোগ দেখাইয়া দেয় ইন্দ্রিয়ের খেলাকে দমন করিলে, মনকে নিস্তব্ধ চিন্তাশূন্য করিলে আমরা আর এক প্রকার চৈতন্যের মধ্যে জাগরিত হই। ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রতীতির মধ্যেই আমাদের জ্ঞান আর বদ্ধ থাকে না,

জ্ঞানের নূতনতর গভীরতর উৎস খুলিয়া যায়। আর তাহাই সত্য অব্যর্থ জ্ঞান। বস্তুর অন্তরের সত্তা তখন আপনা হইতেই প্রতিভাত হয়, তখনই জীব আপনার আধ্যাত্মিক স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারই নাম স্বরাজ্য সিদ্ধি। দ্বিতীয়তঃ শুধু অন্তর্জগৎকে বশীভূত করা নয়, শুধু আত্মচৈতন্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকা নয় কিন্তু সমাধি অবস্থার সে কেন্দ্রীভূত বিপুল চিৎশক্তি দ্বারা আমরা বহির্জগৎকেও বশীভূত করিতে পারি, তাহার দ্বারাই আমাদের স্বভাব আমাদের কর্ম্মজীবন আমাদের পারিপার্শ্বিককে নিয়ন্ত্রিত, গঠিত, পরিচালিত করিতে পারি। ইহাকেই বলা হইয়াছে সাম্রাজ্য সিদ্ধি। ইদানীন্তন কালে এই সাম্রাজ্য সিদ্ধির কথা রাজযোগী তেমন মূল্যবান বলিয়া মনে করেন না, ইহাকে একরকম রাজযোগ সাধনা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। প্রাচীন কালের সাধকগণ কিন্তু সাম্রাজ্য-সিদ্ধি ব্যতিরেকে স্বরাজ্যসিদ্ধিকে কোন দিনই পূর্ণ, সার্থক বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

শরীর ও প্রাণের উপরে উঠাইয়া রাজযোগ মানুষকে পরিপূর্ণ করে তাহার মানসিকক্ষেত্রের মধ্য দিয়া, মানুষকে দেয় প্রকৃত অধ্যাত্ম-জীবনের আস্বাদন। ইহাই রাজযোগের দান। কিন্তু রাজযোগের অভাব এইখানে যে শুধু সমাধি অবস্থাটিকেই সে অতিমাত্র করিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। আমরা চাহি অতীন্দ্রিয় ক্ষেত্রের চেতনাকে স্থূলের মধ্যে জাগরিত করিতে, জগৎকে আত্মার শক্তির দ্বারাই রচিয়া তুলিতে। রাজযোগী কিন্তু স্থূলের সহিত বন্ধন ছিন্ন হইয়া, প্রাণের মনের সকল রকম খেলাকেই

নিস্তব্ধ করিয়া কোন এক তুরীয় লোকে চলিয়া যাইতে চাহেন। জাগ্রত অবস্থাকে হেয় মনে করিয়া তাহাকে বিস্মরণ করিয়া তিনি আপনাকে ঢাকিয়া রাখেন স্বপ্ন বা সুষুপ্তির মধ্যে।

৪

মার্গত্রয়ী—জ্ঞানযোগ

রাজযোগের পরবর্ত্তী স্তরে হইতেছে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই যোগত্রয়। ইহাদের ক্রিয়া রাজযোগের ন্যায় অন্তঃকরণের সবখানি লইয়া নহে। মনের যাবতীয় প্রকরণ নিযন্ত্রিত বশীভূত করিতে ইহারা চেষ্টা পায় না। ইহাদের লক্ষ্য মনের যে প্রধান তিনটি গতি তাহার কোন একটি ধরিয়া তাহারই সহায়ে সমস্ত মানুষটিকে পরিবর্ত্তন করা। সমস্ত মানুষটিকে চারিদিক হইতে ভাঙ্গিবার গড়িবার চেষ্টা না করিয়া, তাহার অন্তরের মূল বস্তুটি ধর, তাহার কেন্দ্রস্থলে আঘাত কর, দেখিবে কত সহজেই সে পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। এই মূল বস্তু, অন্তঃকরণের প্রধান ধর্ম্মরূপে লইয়াছে কেহ জ্ঞান, কেহ প্রেম, কেহ কর্ম্ম এবং সেই অনুসারে তাহাদের সাধনপন্থার নাম হইয়াছে যথাক্রমে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ। মানুষের এই যে ত্রিবিধ ঈষণা সাধারণ জীবনে তাহাদের গতি স্থূলের, অল্পের, খণ্ডের দিকে, সেই দিক হইতে ফিরাইয়া উহাদিগকে সূক্ষ্মের, বৃহতের, পূর্ণের দিকে, ভগবানের দিকে পরিচালিত করিতে হইবে ইহা হইতেছে মার্গত্রয়ের

সাধনার মূল সূত্র। একবার যদি মানুষ তাহার বুদ্ধির কেন্দ্রে অথবা হৃদয়ের কেন্দ্রে অথবা কর্ম্মপ্রেরণার কেন্দ্রে ভাগবত স্পর্শ অনুভব করে তবে ক্রমে অব্যর্থভাবে সকল অন্যতর ক্ষেত্রগুলিই সেই স্পর্শে দিব্যপ্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিবে। রাজযোগ ও এই মার্গ-ত্রয়ীর মধ্যে আর একটি প্রভেদও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। রাজযোগ শরীর ও মনের সংমার্জ্জন ও সংশোধনের উপর যতখানি জোর দেয়, ভাগবত সত্তার অধিকারী করিয়া তুলিবার নিমিত্ত শরীর ও মনকে যত কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্য দিয়া, নানাবিধ প্রক্রিয়ার সাহায্যে শুদ্ধ, সিদ্ধ, পূর্ণ করিয়া তুলিতে চায় মার্গত্রয় তাহা কিছুই করে না। আসন, প্রাণায়াম বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ এ সকল প্রক্রিয়া মানুষকে জোর করিয়া করিতে হয়, বাহির হইতে আপনার উপর কি একটা আরোপ করিতে হয়—ইহাদের মধ্যে কেমন কৃত্রিমতা ও সঙ্কীর্ণতার আভাস মিশ্রিত হইয়া আছে। মার্গত্রয় বলে, মানুষকে লও মানুষ হিসাবে, তাহার সহজ স্বাভাবিক অবস্থায়। মানুষ চায় জানিতে, ভালবাসিতে, কর্ম্ম করিতে—এই তিনের সাহায্যে কি করিয়া তাহাকে পরিবর্ত্তিত করা যায় তাহাই বিচার্য্য। শরীর ও মনের সে কঠিন ব্যায়ামের কসরতের প্রয়োজন কি?

রাজযোগের প্রতিষ্ঠা চিত্ত, জ্ঞানযোগের প্রতিষ্ঠা বুদ্ধি। মানুষ জানিতে চায়, এই জানা'র প্রবৃত্তি ধরিয়া জ্ঞানযোগ। লক্ষ্য কি? ভগবান্। ভগবানকে পাইতে হইলে আগে চাই ভগবানকে জানা। ভুল জ্ঞান বা অজ্ঞান নাশ করা এবং সত্যের জ্ঞান পাওয়াই তবে সকল সাধনা। সত্যরূপী ভগবান্ হইতেছে আত্মা।

এই আত্মসাক্ষাৎকারই সকল জ্ঞানযোগ। জ্ঞানযোগের দুইটি স্তর, অথবা দুইটি ভাগ। প্রথম হইতেছে বিচার ও বিবেক। সত্যকে জানিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জানিতে হইবে সত্য কি নয়, ভুল কি? ইহাই বিচার। আমার সম্বন্ধে আমি যতখানি জানিতে পারি অন্য কিছু সম্বন্ধে তেমন জানা সম্ভব নয়। তাই বিচার আরম্ভ আমাকে দিয়া। আমার মধ্যে সত্যবস্তুটি কি? তাহা কি দেহ? না। প্রাণ? না। মন? না। কারণ এ সকলই নশ্বর, চঞ্চল, ক্ষণিক। সত্য অর্থ সৎ, যাহা আছে, ছিল, থাকিবে। থাকাই যাহার ধর্ম্ম। যখন এই নেতি নেতি করিয়া ভুল প্রত্যয় সব নিরসন করি, যখন গভীরভাবে উপলব্ধি করি দেহ প্রাণ মন সত্য নয়, ইহাদের অতীতে একটা কিছু আছে যাহা অব্যভিচারী সত্তা, যাহা সৎ, যাহা সত্য তখন জাগে আমাদের মধ্যে বিবেক। বিবেক এক সহজ প্রেরণাভরে সত্যের ও মিথ্যার পার্থক্য দেখাইয়া দেয়। বিচার মিথ্যা প্রতীতি খণ্ডন করিবে। বিবেক সত্যবস্তুর আভাসটি ফুটাইয়া তুলিবে—আভাস কেন না, আমার নিগূঢ় সত্য আমিত্বের যে চৈতন্য তাহা একান্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে। বুদ্ধির দ্বারা তাহার ভাবমূর্ত্তি পাই মাত্র। এই ভাবকে উপলব্ধির মধ্যে বস্তুতন্ত্র করিয়া তুলাই জ্ঞানযোগের দ্বিতীয় ভাগ। তাহা হইতেছে এই ভাবের সহিত পরিচিত হওয়া, মনে মনে গাঁথিয়া তুলা, তাহাতে একাগ্র ও তন্ময় হইয়া যাওয়া। জ্ঞানযোগীর ভাষায় বলিতে গেলে, সত্যকে, আত্মাকে পাইতে হইলে চাই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। অবহিত হইয়া শুন সত্য-

মন্ত্র, সত্যের নাম, তাহার সংজ্ঞা, তাহার পরিচয়, চিন্তাকে মনকে সর্ব্বদা তাহার উপর অর্পণ কর, তাহার মধ্যেই ডুবিয়া যাও। ক্রমাগত এইরূপ সেই পরম বস্তুরই কথা ভাবিতে ভাবিতে, কেবল সৎ সত্তারই প্রতীতির মধ্যে অবস্থান করিতে করিতে বাহ্য প্রতীতি সব আমাদের খসিয়া পড়িতে থাকিবে, দেহ প্রাণ মনের খেলা এই মিথ্যা মরীচিকা স্তিমিত হইয়া আসিবে। ফুটিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিবে শাশ্বত গুহাহিত যে আত্মা। তখন সাধকের অন্য কোন চেতনা নাই, সে তখন তুরীয়ে প্রতিষ্ঠিত, তখনই সে শুদ্ধ মুক্ত বুদ্ধ। জগতের জ্ঞান, ইন্দ্রিয়গ্রামের জ্ঞান হইতে নির্ব্বিশেষ মুক্তিলাভ করিয়া তাহার তখন কৈবল্যপ্রাপ্তি, ব্রহ্মসিদ্ধি।

জ্ঞানযোগের মহৎ দান এই ব্রহ্ম, এই সচ্চিদানন্দ—সেই সৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া সকল সত্তা, সেই চৈতন্য যাহা সকল জ্ঞানের মূল, সেই আনন্দ সুখদুঃখের মধ্যে যাহা অন্তঃসলিলা ফল্গুপ্রবাহ। জ্ঞানযোগ মানুষকে দেখাইতেছে তাহার গভীরতম আত্মবস্তু, সকল সীমা সকল খণ্ডতা সকল স্থূলতার অতীতে যে অনির্ব্বচনীয় পূর্ণত্ব, একত্ব, যে নিত্যসত্য, যাহা অপরিণামী, অবিসম্বাদী, শাশ্বত, সনাতন, যেখানে শোক নাই, মোহ নাই, অতৃপ্তি নাই, দ্বন্দ্ব নাই। কিন্তু জ্ঞানযোগের অভাব এইখানে যে মানুষকে তুরীয় অতীন্দ্রিয় বস্তুটির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া তাহার ইহলোকত্রয় তাহার ইন্দ্রিয়গ্রামকে একবারে তুচ্ছ অগ্রাহ্য করিয়াছে। দেহ প্রাণ মনে অসত্য অনৃতের খেলা আছে কিন্তু ইহারা একান্ত অসত্য অনৃত নহে। ইহাদিগকে

সচ্চিদানন্দ-বস্তুতেই গড়িয়া তুলা যাইতে পারে এ কথা জ্ঞানযোগী ধরিতে পারেন নাই। মূল সত্যকে খুঁজিতে যাইয়া সেই সত্যের যে শাখাপ্রশাখাময় ফলফুলে সুশোভিত একটা স্থূল প্রকটমূর্ত্তি আছে তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। খণ্ডকে সীমাকে তিনি দূর করিয়াছেন কিন্তু সেই সঙ্গে বৈচিত্র্যকেও হারাইয়াছেন। এককে পাইয়াছেন কিন্তু একেরই যে বহুত্ব তাহা হারাইয়াছেন। একীকরণ বুঝিয়াছেন কিন্তু সমীকরণ বুঝেন নাই। পূর্ণযোগের সাধক আমরা এককে চাই, কারণ একেই প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সেই এককে ফুটাইয়া তুলিব বহুতে, ব্রহ্মকে জাগ্রত করিব দেহ প্রাণ মনে। একের ও বহুর, ব্রহ্মের ও জগতের, অতীন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জ্ঞানযোগ যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছে আমাদিগকে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, উভয়ের মিলনস্থানটি, সামঞ্জস্য-তত্ত্বটি আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

জ্ঞানযোগীর ভুল এইখানে তিনি নিজের অস্মিতার মধ্যেই ব্রহ্মকে প্রকট দেখিতেছেন, একান্তভাবে সেখানেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু নিজের সত্তাকে জগতের কেন্দ্ররূপে না দেখিয়া, জগতের অন্যান্য বস্তুকে নিজের চৈতন্যের ছায়া বা মায়াখেলারূপে না গ্রহণ করিয়া, যদি অপরের সত্তার মধ্যেও আমরা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারি, প্রত্যেক ব্যষ্টিগত চৈতন্যের মধ্যে একই ব্রহ্মের পূর্ণ স্থিতিটি সাক্ষাৎ করি তবে জগতের বাহিরে নয়, জগতের ভিতরেও এই ব্রহ্মকে পাইব। সকল দ্বৈতের মধ্যেই অদ্বৈতের উপলব্ধি দ্বারা বুঝিব

জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে মায়াবাদী কল্পিত সে ব্যবধান নাই।

বস্তুতঃ ব্রহ্মসত্তার যে চৈতন্য জ্ঞানযোগী কেবল তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্যের ধর্ম্ম যে প্রকাশ, বিকীরণ, বিস্ফুরণ অর্থাৎ শক্তি তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন নাই—চিৎ আর তপঃ একই বস্তু এবং এই তপঃ হইতে সৃষ্টি। শুধু চৈতন্যের দিকেই তিনি জোর দিয়াছেন বলিয়া তিনি পাইয়াছেন নিষ্ক্রিয় বা অক্ষর ব্রহ্ম। কিন্তু চৈতন্যের অন্তরে যে প্রকাশাত্মিকা প্রেরণা যে উদ্‌গমনশীল শক্তি—স পর্য্যগাৎ—লুক্কায়িত তাহার উপর ধ্যান দিলে আমরা দেখিব ব্রহ্মই কর্ম্মপর হইয়া উঠিয়াছেন, অচল স্থাণুই আপনার অচলত্ব স্থাণুত্ব অব্যাহত রাখিয়া গতির মধ্যে পরিণামের মধ্যে প্রকট হইয়াছেন। ব্রহ্মেরই স্বরূপ সত্তা হইতে এই জগৎ বিচ্ছুরিত, তাহার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, সচ্চিদানন্দের পরম শান্তিকে ধরিয়াই বিশ্বের শক্তি চঞ্চল, নিত্য লীলায়িত। জ্ঞানযোগ যদি আমরা এইভাবে সাধনা করি তবে একমেবাদ্বৈতং শান্তং শিবং সুন্দরং জগতের প্রতি বস্তুতে প্রতি গতিভঙ্গিমায় পরিস্ফুট দেখিতে পাইব। আমাদের চিন্তা আমাদের ভোগ আমাদের কর্ম্মজীবন-কেও অন্তরের একটা প্রসন্নতা, বিমলতা, স্বচ্ছতা, শান্তির, মুক্তির প্রদীপ্ত চৈতন্য, অখণ্ড জ্ঞানের উপরেই খেলাইয়া তুলিতে পারিব। তখন সাধারণ জীবনকে আর পরিত্যাগ করিতে হইবে না, জগ-তের কর্ম্ম হইতে আর দূরে থাকিতে হইবে না, এই সকলকে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রাহ্মিস্থিতিরই সুবলয়িত লীলাবিতান করিয়া গড়িয়া তুলিব।

৫

মার্গত্রয়ী—ভক্তিযোগ

জ্ঞানযোগ মানুষকে তাহার মস্তিষ্ক, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি, সত্যকে জানিবার প্রেরণার মধ্য দিয়া সমুন্নত অধ্যাত্ম সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে। ভক্তিযোগ লইয়াছে মানুষের হৃদয়, ভালবাসিবার বৃত্তি, সুন্দরের প্রতি আসক্তি। জ্ঞানযোগীর লক্ষ্য ব্রহ্ম, তুরীয় চৈতন্য। ভক্তের লক্ষ্য ভগবান্, তুরীয় আনন্দ। জ্ঞানীর পন্থা আত্মোপলব্ধি, আপন স্বরূপকে, সত্যসত্তাকে জানা, চেনা, নিজের 'আমিটিই' হওয়া। ভক্তের পন্থা আত্মসমর্পণ, প্রণতি—'আমি'কে 'তুমি'র হাতে ধরিয়া দেওয়া, 'আমার' মধ্যে 'তোমাকে' মিলাইয়া আনন্দে তৃপ্তিতে ভরপুর হইয়া উঠা। ভক্ত বলেন প্রেমতৃষ্ণা অপেক্ষা মানুষের মধ্যে প্রবলতর বৃত্তি নাই। মানুষ চিন্তা করে মানুষ কর্ম্ম করে কিন্তু সে সকল যেন বাহিরের অঙ্গমাত্র। হৃদয়ই তাহার কেন্দ্রস্থল, হৃদয় দ্বারাই মানুষ প্রকৃতপক্ষে পরিচালিত। মানুষকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে, বৃহত্তর সত্তার সহিত তাহাকে পরিচালিত করাইতে হইলে এই ভালবাসার টানের মধ্য দিয়া করাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও আশু ফলপ্রদ। মানুষ ভালবাসিতে চায় মানুষকে, মানুষের স্থলে স্থাপন কর ভগবান্—ভালবাসার পাত্রটি শুধু পবির্ত্তন কর, দেখিবে মানুষ কেমন কত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। মানুষ খুঁজিতেছে ভালবাসার পূর্ণ তৃপ্তি—কেবল মানুষে তাহা সম্ভব কোথায়? কিন্তু

ভগবান্ যে পূর্ণ প্রেম, অখণ্ড ভোগমূর্ত্তি, পরম সুন্দর। ভগবানকে এই ভাবে দেখিয়া, নিজেরই অন্তরের সমস্ত ভালবাসার নিগূঢ়ে রহিয়াছে যে রসরাজ তাঁহাতেই একান্তচিত্ত হইয়া ডুবিয়া যাও। ঈশ্বরে পরানুরক্তি ইহাই সব সাধনার মূল কথা। এই অনুরাগ যাহার হইয়াছে তাহার চিত্তশুদ্ধিও হইয়াছে, তাহার মুক্তিলাভও হইয়াছে।

ভক্তিযোগ ভগবানকে মানুষের অতি গোচর অতি আপনার করিয়া ধরিয়া দিয়াছে। মানুষ চায় নিজেরই অনুরূপ সামগ্রী কিছু, নিজের মতনই যাহা যতখানি তাহার সহিত ঠিক ততখানিই সে মিলিত হইতে পারে। ভক্তিযোগে মানুষ তাহার সেই অতীন্দ্রিয় বা তুরীয়, সেই মহত্তর বৃহত্তর আদর্শটি হইতে আপনাকে আর দূরস্থলিত বলিয়া বোধ করে না। কারণ ভক্তিযোগ মানুষকে খুব মানুষভাবেই দেখিয়া তবে তাহার সাধনপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছে। নানা সম্বন্ধের বন্ধনে আপনাকে জড়াইয়া মানুষ এই জগতে—নানা ভালবাসার পাত্রে আপনার হৃদয়-ধারা ঢালিয়া দিতেছে। পুত্রের প্রতি, বন্ধুর প্রতি, প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর প্রতি এইরূপ ভালবাসার নানা সম্বন্ধ সে পাতিয়াছে। ভক্তিযোগ বলিতেছেন ভগবানকেও এইরূপ যে কোন ভাবে তুমি পাইতে পার। তিনি একটা অদ্ভুত বা অনধিগম্য পদার্থ কিছু নহেন। তিনিই "পিতেব পুত্রস্য সখ্যেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ"। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রেমের রসের এই পঞ্চধা ভাব। এই সকল ভাবই হৃদয়ে রাখ। এবং যে ভাবেই

তুমি ভরপুর থাক না কেন মানুষের দিক হইতে ফিরাইয়া কেবল তাহাকে ভগবানের চারিদিকে ফুটাইয়া তোল। ভক্তবীর হনু-মান, অর্জ্জুন, যশোদাদেবী, শ্রীরাধা এইরূপ এক এক ভাবের মধ্য দিয়া ভগবানকে পাইয়াছিলেন।

কিন্তু ভক্তিমার্গ আবার এ কথাও বলিয়াছেন যে শুধু অনুকূল ভাবে নয় প্রতিকূল ভাবেও, শুধু মিত্রভাবে নয় শত্রুভাবেও ভগ-বানের সাধনা করা যাইতে পারে, ভগবানকে পাওয়া যাইতে পারে। কোন জিনিষ অধিকার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন তাহার সহিত একটা ঘনিষ্ঠ অতি তীব্র সম্বন্ধ স্থাপন করা। মিত্র-ভাবের ন্যায় শত্রুভাবেও এইরূপ একটা তীব্র সম্বন্ধ। মিত্র যেমন আমাদের কাছে পরিস্ফুট গোচর, শত্রুও ঠিক তেমনি পরিস্ফুট গোচর, তাহার অস্তিত্ব আমাদের অন্তরে তেমনি জাজ্বল্যমান। ভগবানকেও এইরূপ শত্রুভাবে দেখিয়া, তাঁহার সহিত পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। এমন কি মিত্রভাব অপেক্ষা, শত্রুভাব অনেক সময়ে সাধকের পক্ষে আশু ফলপ্রদ। কারণ শত্রুভাবের মধ্যে আমাদের অন্তরের যত অশুদ্ধতা, বিকৃতি চারিদিকে ছড়াইয়া লুকাইয়া রহিয়াছে তাহা সব একত্রিত একমুখী বিপুল হইয়া উঠে। এবং যখন এই বিরাট স্তূপটি ভগবানের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হয়— তখন তিনি একযোগে একটি আঘাতে সে সমস্তখানি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবার সুবিধা পান। মিত্রভাবে কিন্তু ভগবানকে সাধ-কের প্রতি অঙ্গ হইতে অবিরাম খুঁটিয়া খুঁটিয়া তবে দোষগুলি দূর করিতে হয় এবং ইহা সময় সাপেক্ষ। সেইজন্যই বোধ হয়

কথিত আছে মিত্রভাবে মুক্তি সাত জন্মে, শত্রুভাবে মুক্তি তিন জন্মে মাত্র। বিদ্বেষ প্রণয়েরই উল্টা দিক। ঘোর বিদ্বেষকে প্রণয়ে সহজেই পরিণত করা যায়। কিন্তু উদাসীনতা যেখানে সেখানে এই প্রিয় সম্বন্ধ স্থাপন করা দুরূহ।

ভগবান্ শুধু অতীন্দ্রিয় অদেহী সচ্চিদানন্দ নহেন। জগতের স্থূলরূপ মানুষের ইন্দ্রিয়াদির খেলার মধ্যে ভগবানেরই আনন্দ স্বরূপ মূর্ত্ত হইয়া ধরা দিয়াছে। ভক্তিযোগের ইহাই মূলতত্ত্ব। জগতের যাবতীয় ভোগ্যবস্তু, সে সকলকে ভোগ করিবার যন্ত্রস্বরূপ যাবতীয় ইন্দ্রিয় এবং সকলের প্রতিষ্ঠান এই দেহ এই জগৎ—সবই সত্য ও নিত্য। ইহাদের প্রত্যেকের একটি সত্য সত্তা আছে, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সত্য সম্বন্ধ আছে। তাহার পূর্ণ প্রতিকৃতি যেখানে তাহাই ভগবান্। স্থূলের যত প্রকাশ যত বিভব সবই ভগবানের মধ্যে আছে এবং সম্পূর্ণভাবেই আছে। আছে বলিয়াই বাহিরে তাহাদের এই বিকাশ। ভগবান্ তাই সকল ঐশ্বর্য্য সকল বীর্য্য সকল শ্রীর আধার—তাঁহাতেই সকল 'ভগ', তাঁহাতেই সকল ভোগ, সকল রস, সকল আনন্দ। স্থূল বস্তুর স্থূল বিকাশের মধ্যে রহিয়াছে যে ভাগবত বস্তু ভাগবত বিকাশ তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা তাহার রসে মজিয়া যাওয়াই ভক্তের লীলা।

ভক্ত জগৎকে অস্বীকার করেন না, জগৎকে তিনি ভগবানেরই নিগূঢ় লীলার বাহ্যমূর্ত্তি, ভগবানেরই রাসলীলার স্থূল আশ্রয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া দেখেন। কিন্তু এই জগতের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ

তাহা সাক্ষী অথবা উদাসীন রসগ্রাহকের সম্বন্ধ মাত্র। ভাগবত আনন্দে তিনি গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু ভাগবত তপঃশক্তি মানুষকে শুধু (passive) ভোক্তা নয়, (active) কর্ত্তা হইতে নিযুক্ত করিতেছে তাহা তিনি অনুভব করেন না। ভক্ত জগতে যাহা যেমন আছে বা হয় তাহাতেই সমরসাত্মক এক বিপুল আনন্দের ঘোরে মগ্ন। এই আনন্দের খেলারও যে একটা বিশেষ লক্ষ্য, বিশেষ গতি, বিশেষ প্রণালী আছে মানুষ প্রজ্ঞার দ্বারা তাহা অন্তরে উপলব্ধি করিবে, কর্ম্মের দ্বারা ইহাকে বিরাট করিয়া তুলিবে—তাহার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। জগৎ তাঁহার চক্ষে তাই অর্দ্ধস্ফুট, ভাবের কুয়াসায় আবৃত, উহা জাগ্রত বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিতে পারে না। ভাবপ্রবণতার সহজ মাদকতার নেশায় মজিয়া ভক্তির সাধক সাধারণ জগৎ হইতে ক্রমে দূরে সরিয়া পড়েন। ভক্তিমার্গের ইহাই অভাব।

ভগবানের সহিত জ্ঞানীর সম্বন্ধ একেবারে অতীন্দ্রিয়ে, সৃষ্টির বাহিরে। ভক্ত সেই সম্বন্ধটিকে স্থূলতর মানুষের নিকটতর করিয়া দেখিয়াছেন। সৃষ্টির ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভক্তিমার্গের ইহাই বিশিষ্টতা। জগৎ লইয়া, মনুষ্যজাতি লইয়া যে সিদ্ধ জীবন, যে দিব্য সাম্রাজ্য তাহার একমাত্র প্রতিষ্ঠা হইতে পারে এই প্রেম, ভাগবত প্রেম। মানুষে মানুষে, শুধু মানুষে মানুষে কেন, মানুষে ও সৃষ্টপদার্থ মাত্রেরই মধ্যে যে একটা আনন্দের সামঞ্জস্যের মিলনের সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে, সে মিলনের খেলার সম্ভাবনা দেখাইয়াছে ভক্তিমার্গ। ভক্তিমার্গ আরও

বলিতেছে, মানুষের যে রূপতৃষা, ভোগবাসনা, ইন্দ্রিয় পরিচালিত জীবন তাহার মধ্যে ভগবানেরই ভোগেচ্ছা লুক্কায়িত, তাঁহারই আনন্দ স্ফুরিত। তাই এ সকলকে ছাড়িয়া দিয়া নয়, কিন্তু ইহা-দিগকে ভগবানের মধ্যে শুদ্ধ ও পরিপূর্ণ করিয়া লইয়াই দিব্য-জীবন পাওয়া যাইতে পারে।

৬

মার্গত্রয়ী—কর্ম্মযোগ

কর্ম্মযোগী কর্ম্মজীবনের মধ্য দিয়া ভগবানকে আরও বাস্তব, আরও প্রকট করিয়া দেখেন। ভগবান্ জ্ঞাতামাত্র নহেন, শুধু ভোক্তাও নহেন, তিনিই আবার নিয়ন্তা, ঈশ্বর। তিনিই বিরাট কর্ম্মী—এ কর্ম্মশীল জগৎ তাঁহারই বিরাট অঙ্গ সঞ্চালনা। ভগবানের যে স্পষ্টতম স্থূলতম প্রকাশ, জাগতিক প্রতিষ্ঠানে মানুষ যাহার সহিত ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত, যাহা ব্যতিরেকে কেহ ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারে না, সেই কর্ম্মরাজীর মধ্য দিয়া কর্ম্মযোগী ভগবানের সহিত সংযুক্ত হইতে চাহেন। কর্ম্মযোগে তিনটি ধাপ লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, জীবনের প্রতি কর্ম্ম, যে অবস্থায় যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই সাধক থাকুক না কেন তদুচিত প্রত্যেক কর্ত্তব্য করিতে হইবে ভগবানকে উদ্দেশ্য করিয়া, প্রত্যেক কর্ম্মটি পুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ তাঁহারই চরণে নিবেদন করিতে হইবে। কারণ মানুষ সাধারণতঃ কর্ম্ম করে অহংকারবিমূঢ় হইয়া, এই অহংকারই

তাহার ও ভগবানের মধ্যে একমাত্র অন্তরায়, এই অহংকারের দেউলটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াই তাহাকে অনন্তের বৃহৎ বিসারে চলিয়া যাইতে হইবে। তাই নিজের জন্য নয়, নিজের লাভালাভ, সুখ-দুঃখ, জয়পরাজয়ের প্রতি উদাসীন হইয়া, শুধু কর্ম্মের জন্যই কর্ম্ম, ভগবান্ চাহিতেছেন তাই করিতেছি—এই ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্মযোগের ভিত্তি হইতেছে এই ফলাকাঙ্খা শূন্য হইয়া কর্ম্ম করা—আত্মসমর্পণ ও নিষ্কামতা। তারপর এই আত্মসমর্পণ ও নিষ্কামভাব যখন পূর্ণতর দৃঢ়তর হইয়া উঠে তখন ফলাফলের জন্য কোন অপেক্ষা ত থাকেই না, কর্ত্তব্যের জ্ঞান কর্ম্মের উপর অধিকারও মুছিয়া যায়। আমার করণীয় অকরণীয় কাজ বলিয়া কিছু নাই, আমার উৎসর্গ করিবার কিছু নাই, কারণ আমি নিজে কিছু করিতেছি না। ভগবানই আমার দ্বারা তাঁহার কর্ম্ম করিয়া লইতেছেন। তাঁহারই বিরাট শক্তি তখন সাধকের মধ্যে আবির্ভূত হয়, সাধক তখন স্বতন্ত্রতাবিহীন যন্ত্রটির মত ভগবানের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া চলে, বাত্যামুখে তদ্‌গতপ্রাণ পত্রটির মত ঘুরিয়া চলে। আমি তখন কর্ত্তা নহি। আমি দ্রষ্টা, পুরুষ দেখিতেছে মাত্র, প্রকৃতিই সব করিতেছে। শেষ অবস্থা তখন যখন ভাগবত প্রকৃতির পূর্ণ প্রেরণা সাধকের মধ্যে কর্ম্ম করিয়া চলে। তখন আমি বোধ নাই। আমার দৃষ্টি নহে, ভগবানের দৃষ্টি। আমি মিশিয়া গিয়াছে পরমপুরুষে, এ দেহ মন প্রাণ মিশিয়া গিয়াছে দিব্য প্রকৃতিতে। পরমপুরুষের ঈষণাতেই চলিয়াছে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত গ্রথিত আমার ব্যক্তিগত প্রকৃতি। ভগবান্

তখন শুধু আমার সংস্কারগত প্রেরণা ধরিয়া, আমার পারিপার্শ্বিক নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের অনুসারেই কর্ম্ম করেন না, উহাদের মধ্যেই আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন না। তিনি নিজের অলৌকিক ঐশী-শক্তির দ্বারা তাঁহারই অভিপ্রায় অনুসারে নূতন প্রেরণার মধ্যে নূতন কর্ম্ম ফুটাইয়া তুলেন।

কিন্তু সাধারণতঃ কর্ম্মযোগী কর্ম্ম করেন কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবার জন্য। জীব বদ্ধ, কারণ তাহার কর্ম্ম আছে। কর্ম্মের নাশেই তবে নিঃশ্রেয়স কৈবল্য। তবে কর্ম্মের নাশ সম্ভব কর্ম্ম হইতে বিমুখ হইয়া নয়। কর্ম্ম করিয়াই কর্ম্ম ক্ষয় করিতে হইবে। কিন্তু অহংকারের দ্বারা কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্তি নাই। তাই যে কর্ম্ম কর সবই ভগবানের যজ্ঞমূর্ত্তিতে আহুতি প্রদান কর। এই-রূপেই সকল কর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। ভিতরে কর্ম্মের বীজ নষ্ট হইলেও যতদিন দেহ থাকে ততদিন পূর্ব্ব সংস্কারের প্রেরণা বশতঃ দেহ কিছুদিন কর্ম্ম করিয়াই চলে। কিন্তু এ দেহও শেষে ভাঙ্গিয়া পড়ে, পঞ্চভূতের বন্ধনটুকুও তখন টুটিয়া যায় তখন তুমি চলিয়া যাও তোমার স্বরূপে, আর তোমাকে সংসারচক্রে ঘুরিতে হয় না। তখনই তোমার পূর্ণ সিদ্ধি। সাধারণ কর্ম্মযোগীর ইহাই আদর্শ।

কিন্তু কর্ম্মযোগকে এইরূপ সঙ্কীর্ণ করিয়া না লইলেও লইতে পারি। কর্ম্ম স্বয়ং কিছু বন্ধনের কারণ নয়। বন্ধনের কারণ অহংকার ও অজ্ঞানতা। কর্ম্ম ভগবানেরই স্বরূপ হইতে উৎসারিত হইয়াছে। চিৎশক্তির দ্যুতিই যে কর্ম্মে বিলসিত, ভাগবত আন-

দই কর্ম্মে লীলায়িত। অহংকার বিনাশ কর, অজ্ঞানতা দূর কর, কিন্তু সেই সঙ্গে কর্ম্মও যে বিনষ্ট দূরীভূত হইবেই তাহা নয়। কারণ কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা আরও সত্য ও গভীরতর প্রদেশে। প্রকৃত কর্ম্মযোগ আমাদিগকে বরং ইহাই শিক্ষা দেয়, অহংকার অজ্ঞানতা ভিতরের ময়লা দূর হইলে কর্ম্মের স্রোত শুদ্ধতর বিপুলতর হইয়াই ছুটিয়া বাহির হয়। মুক্তির পরেই বস্তুতঃ যথার্থ কর্ম্ম সম্ভব, ভিতরে ব্রাহ্মীস্থিতিকেই অব্যাহত রাখিয়াই বাহিরে কর্ম্মজীবনের বিরাট খেলাটি সৃষ্টি করিয়া চলিতে পারি। তখন যে কর্ম্ম করি তাহা আমার অন্তরাত্মার তুরীয়ের ভাগবত প্রতিষ্ঠায় কর্ম্ম—স্থাণু মুক্ত অনন্ত সত্তাকে পশ্চাতে জাগ্রত রাখিয়া যে সচল শক্তি প্রকট হইয়াছে।

এখন আমরা বুঝিতে পারিব দুইটি কারণে মার্গত্রয়ী আমাদের পূর্ণ সন্তোষ দেয় না। প্রথমতঃ ইহাদের লক্ষ্য শুধু আধ্যাত্মিকতার, স্বরূপের নগ্নতা। অধিভূত যাহা, রূপ যাহা তাহার পরিপূর্ণতাও যে আধ্যাত্মিকতা এ কথা ইহারা ধরিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম মানুষের এই তিনটি বৃত্তি ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ বলিয়া পৃথক পৃথক পন্থা নির্দ্দেশ করা কৃত্রিমতার সৃষ্টি মাত্র। প্রকৃত জ্ঞানী যে ঈশ্বরে পরানুরক্তি তার আপনা হইতেই হয়। এবং ভগবানকে যে ভাল-বাসিয়াছে জ্ঞান তাহারই মধ্যে ফুটিয়া উঠে। জ্ঞানের, প্রেমের সার্থকতা কর্ম্মের মধ্যে—কর্ম্মী যিনি তাঁহার কর্ম্ম বিধৃত জ্ঞানের মধ্যে, প্রেমের মধ্যে। পূর্ণভাবের সাধক জ্ঞান প্রেম কর্ম্ম যুগপৎ

চাহেন, আপনাকে কাটিয়া ইহার কোনটিকে একেবারে উপেক্ষা করিতে বা ইতর স্থান দিতে তিনি প্রস্তুত নহেন।

বিভিন্ন যোগপন্থার বিশেষ গুণ কি, তাহা আমরা দেখিলাম, অভাবই বা কোথায় তাহাও দেখিয়াছি। আমরা এখন কোন্ পন্থা অনুসরণ করিব? আমাদের অন্তর বাহিরের সকল স্তর, আমাদের সকল সত্তা সকল শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি চাই। ভগবানকে আমরা সর্ব্বতোভাবে চাই, স্বরূপের মধ্যে তাঁহাকে চাই, রূপের ঐশ্বর্য্যেও তাঁহাকে চাই। এই উদ্দেশ্যকল্পে হঠযোগ রাজযোগ প্রভৃতি প্রত্যেক পন্থারই কিছু না কিছু দান করিবার আছে। তবে কি সকলগুলিই আমাদিগকে যুগপৎ অভ্যাস করিতে হইবে? কিন্তু ইহা সম্ভব নয়। পন্থাগুলিকে এত বিভিন্ন প্রকৃতির করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে, প্রত্যেকের আছে আপন আপন বিশেষ নিয়ম, বিশেষ প্রক্রিয়া, তাহারা এমন পরস্পর বিরোধী, এত সূক্ষ্ম, এত জটিল, যে সবগুলিকে অভ্যাস করিতে গেলে আমরা এক বৃহৎ অপায়ের সৃষ্টি করিব মাত্র। একটির পর একটি করিয়া ক্রমে ক্রমে সবগুলি যে আয়ত্ত করিব তাহাও সম্ভব নয়। এক জীবনে ত নয়, বহু জীবনেও তাহা সুদুষ্কর।

আমাদিগকে এমন একটি তত্ত্ব বাহির করিতে হইবে যেখানে সকল পন্থার সামঞ্জস্য, এমন একটি সূত্র ধরিতে হইবে যাহাতে সব পন্থাগুলিরই গূঢ়তম রহস্য বিধৃত। এমন বস্তু যদি কিছু পাই তাহাই আমাদের আদর্শের উপযোগী। যোগমার্গাবলীর বাহ্য অঙ্গগুলি আমরা পরিত্যাগ করিব, অবান্তর ঠাট যাহা তাহা দূরে

রাখিব। এমন একটি সজীব সত্যকে ধরিব যাহা সকল পন্থার প্রাণ, যাহা সকলকেই পূর্ণতায় ভরিয়া ধরিতে পারে। এই মূল সত্যটির আলোকেই আমরা বুঝিতে পারিব কোন্ পন্থার কতটুকু গ্রহণ করিতে হইবে, কতটুকু বর্জ্জন করিতে হইবে, ঠিক কি ভাবে আমাদিগকে চলিতে হইবে।

৭

বৈদান্তিক যোগ ও তান্ত্রিক যোগ

সাধারণ প্রচলিত যে যোগপন্থাসকলের বিবরণ দিয়াছি, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিব সে সকলেরই অন্তরালে একটি মূলভাব রহিয়াছে—আপাততঃ তাহাদিগকে যতই বিভিন্ন বলিয়া বোধ হউক না কেন। যে মূলবস্তুটি আশ্রয় করিয়া এই সকল সাধনপন্থায় চলি তাহা হইতেছে জ্ঞান। এবং এই জন্য উহাদিগকে বলা যাইতে পারে বৈদান্তিকমার্গ। জ্ঞানযোগী হউন, ভক্তিযোগী হউন আর কর্ম্মযোগীই হউন সকল সাধকের নির্ভর হইতেছে জ্ঞান, মূলতঃ জ্ঞানকেই লক্ষ্য ও উপায়রূপে ধরিয়া তাঁহারা চলেন। জ্ঞানীর বিচার বিতর্ক জ্ঞানের একটি রূপ মাত্র—এ জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা বুদ্ধিতে। কিন্তু ভক্ত বা কর্ম্মীর জ্ঞান তর্কবুদ্ধিপ্রসূত না হইলেও তাহা জ্ঞানই। ভক্তের জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইতেছে হৃদয়ে—সে জ্ঞান ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রেম, শ্রদ্ধা, বিশ্বাসের ভিতর দিয়া। আর কর্ম্মীর জ্ঞান তাঁহার ইচ্ছাশক্তির পশ্চাতে, এই জ্ঞানই ইচ্ছাশক্তির

ভিতর দিয়া কর্ম্মে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিতেছে। রাজযোগ, হঠ-যোগেরও অন্তরালে রহিয়াছে এই জ্ঞানেরই প্রাধান্য। এ সকল যোগে পুরুষই সাধক, আত্মাই দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা ও ভোক্তারূপে সাধনা করিয়া চলিয়াছে, সেই স্থির করিয়া দিতেছে কি রাখিতে হইবে, কি বর্জ্জন করিতে হইবে, আধারকে কেমন সাজাইতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে এই পুরুষই হইতেছে লক্ষ্য—এই চৈতন্যময় আত্মসত্তার সহিত মিলিত হওয়াই যোগসিদ্ধি।

কিন্তু ভারতবর্ষে আর এক প্রকার যোগ প্রচলিত আছে, তাহার প্রতিষ্ঠা জ্ঞানের উপর নহে, পুরুষ তার নিয়ন্তা নহে। তান্ত্রিকযোগে সাধক হইতেছে প্রকৃতি, উপায় হইতেছে শক্তি। যে সাধনায় পুরুষ হইতেছে সাধক আর জ্ঞানই উপায় তাহার মূল-কথা উদাসীনতা, জগতের খেলা হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করা, সরাইয়া ফেলা। তান্ত্রিক কিন্তু এই খেলাকেই জড়াইয়া ধরিয়াছেন, প্রকৃতির নিগূঢ়ে রহিয়াছে যে আদ্যাশক্তি, যে তপঃশক্তি তাহারই অদম্য বলে, তাহারই স্ব-ঈরিত পন্থায় তিনি চলিয়াছেন। বৈদান্তিক প্রকৃতিকে জানেন মায়াময়ী বলিয়া। প্রকৃতি অন্ধ উচ্ছৃঙ্খল, ইহার মধ্যে যতটুকু চেতনার ছায়া তাহা পুরুষের সংস্পর্শে। তাই বৈদান্তিক সাধক প্রকৃতির হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে চাহেন না, প্রকৃতিকে তাহার সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে ধাবিত বিকশিত হইতে দেওয়াও তাঁহার লক্ষ্য নয়। তান্ত্রিক কিন্তু প্রকৃতিকে জানেন চিন্ময়ী বলিয়া। তাই তাঁহারই প্রেরণায় সম্পূর্ণ ভর করিয়া চলিতে তান্ত্রিকের এতটুকুও ইতস্ততঃ নাই। বৈদান্তিকের উদ্দেশ্য

প্রকৃতির ছায়াপাত হইতে পুরুষকে ক্রমে ক্রমে মুক্ত করিয়া লওয়া। তান্ত্রিক প্রকৃতিকে জগৎশক্তির সমস্ত খেলাকেই সত্য বলিয়া আনন্দপূর্ণ বলিয়া আলিঙ্গন করেন। তাই প্রকৃতিকে তিনি পুরুষের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, শক্তিকেই অধ্যাত্মজীবনের সাম্রাজ্ঞীরূপে বরণ করিয়াছেন।

সাধারণ জীবনের যে খণ্ডতা অসম্পূর্ণতা, আধারের যে অসামর্থ্য মলিনতা তাহাকে দূরে রাখিয়া নিগ্রহ করিয়া, তাহার দিক হইতে সকল মনোযোগ ফিরাইয়া জীবনের, আধারের অন্তরালে অতীতে যে স্থাণু নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ অদ্বৈত জিনিষটি আছে ধ্যানে, মনের একাগ্রতায় তাহাকেই জাজ্বল্য করিতে চাহিয়াছেন বৈদান্তিক যোগী। তান্ত্রিক বলিতেছেন জীবনের পূর্ণতার উৎস জীবনের মধ্যেই, আধারের শুদ্ধির কারণ আধারের মধ্যেই আর কোথাও নয়। তান্ত্রিক প্রকৃতির মধ্যেই এমন একটি মৌলিক তত্ত্ব পাইয়াছেন যাহার প্রাণ অদম্য বল, অনন্ত শক্তি, অব্যাহত কর্ম্মপ্রেরণা—ইহাই আবার শুদ্ধ পূর্ণ চেতনাদীপ্ত। জীবনকে, আধারকে জীবনের আধারের এই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর তর্জ্জনীসঙ্কেতে জীবনের কর্ম্মবহুল ভোগবহুল বিক্ষুব্ধতার, আধারের সকল প্রাকৃত-প্রেরণার মধ্য দিয়াই চালাইয়া তিনি গড়িয়া লইতেছেন।

বৈদান্তিক সাধনার বিষয় সৎ, উপায় বৈরাগ্য। তান্ত্রিক সাধনার বিষয় তপঃ শক্তি, উপায় ভোগ। বৈদান্তিক পুরুষকে অতিমাত্র করিয়া ধরিয়াছেন, তান্ত্রিক প্রকৃতিকে অতিমাত্র করিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু বৈদান্তিক ও তান্ত্রিক এই যে সৎ'এর বিরুদ্ধে

শক্তিকে, শক্তির বিরুদ্ধে সৎকে দাঁড় করাইয়াছেন ইহাতে তাঁহারা উভয়েই সত্যের অর্দ্ধেকটুকু পাইয়াছেন মাত্র। বৈদান্তিক শক্তিকে হারাইয়া সৃষ্টির ভোগের আনন্দবিরহিত সাধুসন্ন্যাসীর সৃষ্টি করিয়াছেন। তান্ত্রিকও তেমনি সৎকে হারাইয়া প্রকৃতির উন্মার্গগামী স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া অনাচারকলুষিত ভৈরব ভৈরবীর জন্ম দিয়াছেন। বৈদান্তিক যেমন ত্যাগকে ত্যাগ বলিয়াই মহনীয় করিয়া দেখিয়াছেন, তান্ত্রিকও ভোগকে ভোগ বলিয়াই মহনীয় করিয়া দেখিয়াছেন। যাহা উপায় বা সহায়মাত্র উভয়ে তাহাকেই লক্ষ্যের অধিক করিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সৎ ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি, এমন কি ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ইহাদের একটি যে উপরে আর একটি যে নীচে তাহা নয়, উভয়েই সমান পর্য্যায়ে। পূর্ণযোগের যে সামঞ্জস্য তাহার মূল এইখানে। পূর্ণযোগীর চক্ষে আত্মা বা পুরুষ হইতেছে ঈশ্বর, প্রকৃতি হইতেছে তাঁহারই আপন কর্ম্মনিষ্পাদনী শক্তি। পুরুষ অথবা সৎ হইতেছে শুদ্ধ অখণ্ড অসীম আত্মসত্তা। শক্তি হইতেছে চিৎশক্তি—ঐ শুদ্ধ সত্তারই চেতনার প্রেরণা, খেলা। স্থিতি ও গতি, বিরাম ও কর্ম্মের মধ্যে যে সম্বন্ধ, উহাদের মধ্যেও সেই একই সম্বন্ধ। শক্তি বা কর্ম্মপ্রেরণা যখন শুধু থাকা শুধু অস্তির চেতনায় যে আনন্দ তাহার মধ্যেই বিলীন তখন হইতেছে স্থিতি বা বিশ্রাম। ইহারই অপর নাম ত্যাগ। আবার যখন পুরুষ আপন শক্তির বহুবিধ কর্ম্মে আপনাকে ছড়াইয়া দিতেছেন, তখনই কর্ম্ম, তখনই সৃষ্টি, তখনই

'থাকা' নয় 'হওয়া'র আনন্দ। আর ইহাই ভোগ। এই যে হওয়ার আনন্দ ইহাই সৃষ্টির, জাগতিক প্রকাশের প্রসূতি, মূল কারণ। আর যাহার সহায়ে যে উপায়টিকে ভর করিয়া আনন্দ বস্তুরাজী সৃষ্টি করিতেছে, এক বহু হইতেছে তাহাই তপঃ।

এই তপঃশক্তি পুরুষেরই চিৎশক্তি অর্থাৎ চিন্ময় পুরুষ যখন আপন শুদ্ধ সত্তার মধ্যে নিগূঢ় অব্যক্ত অনন্ত রূপসম্ভাবনীয়তার উপর আপনার চেতনাকে খেলাইয়া তুলে তখনই উদ্ভূত হয় বস্তুর ভাবময় স্বরূপ, ব্যষ্টির বিশিষ্টের ঋতময় সত্যময় অন্তরাত্মা—যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান অথবা সত্যভাব সকল জ্ঞান সকল শক্তির আধার যে আত্মসত্তা তাহা হইতে নিসৃত হই-তেছে বলিয়া আপনাকে অব্যর্থরূপে পরিপূর্ণ করিতে চলিয়াছে। আমাদের দেহ প্রাণ ও মনের অন্তরালে রহিয়াছে এই বিজ্ঞানের ধর্ম্ম। এই বিজ্ঞানই আবার এক নৈসর্গিক প্রেরণাবলে দেহ প্রাণ ও মনের মধ্যে রূপ গ্রহণ করিয়া আপনাকে জাগরূক করিয়া ধরিতে চাহিতেছে। প্রকৃতপক্ষে সকল যোগ সাধনারই প্রতিষ্ঠা এই চিৎভাব এই বিজ্ঞান এই সত্যং ঋতং বৃহৎএর অপ্রত্যাহত কার্য্য-কারিতার উপর। সকল যোগপন্থা ইহাকেই মানিয়া চলিয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান্ এই সত্যটিকেই লক্ষ্য করিয়া কতবার বলিতে-ছেন, 'শ্রদ্ধান্বিত' 'ভাবসমন্বিত' হইয়া যে যাহা চায় সে তাহা পাইবেই, যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা, যেরূপ ভাব সে তাহাই হয়। যো যৎশ্রদ্ধঃ স এব সঃ।

পূর্ণযোগের স্বরূপ

তবে যোগের প্রথম কথা, যেখান হইতে আরম্ভ করিব তাহা হইতেছে কি রকম ভাবে ও শ্রদ্ধায় আমরা প্রকৃতিকে দেখিতেছি। মূলতঃ আমরা দেখিয়াছি প্রকৃতি হইতেছে আপনারই শক্তির মধ্য দিয়া পুরুষের আত্মবিকাশ, আত্মচরিতার্থতা। কিন্তু কার্য্যতঃ প্রকৃতির দুইটি গতি, দুই রকম খেলা। একটি সাধারণ নিত্য নৈমিত্তিক আর একটি নিগূঢ় দিব্যমূর্ত্তি, একটি উপরের স্তরের আর একটি নীচের স্তরের। সাধারণতঃ যেমন ভাবে আমরা জীবন কাটাই, অহংকারের বশবর্ত্তী হইয়া, অজ্ঞানের অশক্তির দুঃখের ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া তাহাই প্রকৃতির নীচের স্তরের খেলা বা প্রাকৃত জীবন। কিন্তু অহংকার ছাড়াইয়া, ক্ষুদ্রতা, ভেদবুদ্ধি অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের শক্তির আনন্দের মাঝে যখন উঠিয়া যাই তখনই পাই প্রকৃতির পরামূর্ত্তি, তাহা লইয়াই দিব্য জীবন। এই নীচের ধাপ হইতে উপরে উঠার নামই যোগ। ইহা দুই ভাবে হইতে পারে। এক, নীচ হইতে যখন একেবারেই উঠিয়া যাই, প্রকৃতির অপরা খেলাটিকে নিঃশেষ বর্জ্জন করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাই অথবা যখন নীচকে ইহকে শুধু পরিবর্ত্তিত পরিশুদ্ধ করিয়া উচ্চতরটির অমৃতের মধ্যে তুলিয়া ধরি।

কিন্তু যেটিই লক্ষ্য হউক না কেন, আমাদের প্রতিষ্ঠা এই নীচের স্তরে, কাজেই ইহাকেই আশ্রয় করিয়া তবে অপরটি

পাইতে হইবে। সাধারণ যোগ সকলের লক্ষ্য ইহাকে পরিত্যাগ করা তাই তাহার পন্থা প্রাকৃত প্রেরণার দুই একটি বিশেষ ভঙ্গিমাকে আশ্রয় করিয়া, আর সব ভুলিয়া তাহারই সহায়ে শেষে সমুচ্চের ভগবানে মিশিয়া যাওয়া। পূর্ণযোগী কিন্তু চাহিতেছেন অপর জিনিষটী, তিনি চাহিতেছেন প্রাকৃতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লইয়া তাহারই মধ্যে অতিপ্রাকৃতের দিব্যের খেলা ফুটাইয়া তুলিতে। কারণ প্রকৃতির প্রাকৃত খেলার মধ্যে পুরুষের ভগবানেরই নিগূঢ় প্রেরণা পরিস্ফুট হইযা উঠিতেছে। অন্তর্য্যামীর পূর্ণ বিকাশে পূর্ণ চরিতার্থতাই হইতেছে পূর্ণ সত্য—তাহাতেই প্রকৃতির পূর্ণ সার্থকতা। তাই পূর্ণযোগী জীবনের কোন খণ্ডিত বা বিশেষ প্রকরণের মধ্যে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিবেন না। তাঁহার সমস্ত জীবনটিই হইতেছে যোগ। জীবনের সকল বৈচিত্র্য সকল জটিলতার, যত ক্ষুদ্র যত বৃহৎ ব্যাপার সমস্তই অন্তর্ভূক্ত করিয়া দিতে হইবে যোগের মধ্যে। সাধারণ জীবনে প্রকৃতি অখণ্ডভাবে তাহার পূর্ণ ভঙ্গিমাটি লইয়াই আমাদের মধ্যে খেলিতেছে। পূর্ণযোগের সাধক তাই সিদ্ধ জীবনে প্রকৃতির পূর্ণ অখণ্ড খেলাটিই চাহেন। প্রভেদ শুধু থাকিবে এইখানে যে সাধারণ জীবনে আমরা প্রকৃতির স্থূল গতির আধার, যোগযুক্ত জীবনে আমরা হইব দিব্য প্রকৃতির আধার। আমাদের সমগ্র সত্তাটিকেই পরিবর্ত্তিত করিয়া ধরিতে হইবে ভাগবত সত্তার দ্যোতনায়।

সুতরাং উপায় হইতেছে আমাদের সমস্ত সত্তাখানিকে জাগ্রতভাবে ভাগবত সত্তার সহিত সংযুক্ত সম্মিলিত করিয়া ধরা। ভগ-

বানকে ডাকিয়া আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এইখানে, তাঁহা-রই প্রভাবে আমাদের প্রকৃতি তাঁহারই প্রকৃতির অনুরূপ হইয়া গড়িয়া উঠিবে। এক হিসাবে ভগবান্ নিজেই হইবেন আমাদের সাধনার সাধক, আমাদের অন্তরের পুরুষ, আমাদের যোগের নিয়ন্তা। তিনিই আমাদের ব্যক্তিগত সত্তাটিকে আশ্রয় করিয়া, যন্ত্রবৎ পরিচালিত করিয়া দিব্যমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইবেন। কারণ আমরা বলিয়াছি আমরা, আমাদের জীবন, আমাদের পরিপূর্ণ সত্তা হইতেছে একটা ভাব বা তপঃশক্তির অভিব্যঞ্জনা। আমাদের অন্তরস্থিত যে দিব্য প্রকৃতি, আমরা অখণ্ডভাবে যে বস্তুটি তাহা নিহিত রহিয়াছে ঐ ভাব ঐ তপঃশক্তির মধ্যে। এই তপঃশক্তিকে যদি খেলাইয়া তুলিতে পারি তবে তাহা আপনার ভাবের চেতনার অব্যর্থ অটুট প্রসরণে আমাদের প্রাকৃত প্রকৃতিটি পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহার নিজের যে দিব্য অখণ্ড প্রকৃতি তাহাকেই সেখানে প্রতি-ষ্ঠিত করিবে। যাহা খণ্ডিত, যাহা তমসাবৃত তাহার মধ্যে অবতীর্ণ হইবে যাহা দিব্য যাহা সর্ব্বজ্ঞ যাহা সর্ব্বকৃৎ। এবং এই বস্তুটিই ক্রমে আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত প্রকৃতিখানিকে শুদ্ধ জ্ঞানো-দ্ভাসিত বীর্য্যপরিপ্লুত করিয়া গড়িবে, সকল মানবীয় জ্ঞান, সকল নশ্বর কর্ম্মচেষ্টার পরিবর্ত্তে তাহার নিজের দৈবীলীলাটিই ফুটাইয়া তুলিবে।

পূর্ণযোগের এই যে মূলকথা ভাগবত ভাব, পূর্ণ বিজ্ঞানশক্তিকে প্রকটিত করা, সাধনার দিক হইতে তাহারই অর্থ হইতেছে অহং-কার বিসর্জ্জন, অহং এবং তার সমস্ত ক্ষেত্রখানি ক্রমে ক্রমে উৎসর্গ

করিতে হইবে অহং এর অতীতে যে বস্তুটি তাহার নিকটে, তাহারই বিরাট দুর্লক্ষ্য অথচ অব্যর্থ কর্ম্মপ্রেরণার নিকটে। এ সাধনমার্গ সহজও নয় সরলও নয়। এ পথে প্রয়োজন বিপুল শ্রদ্ধা, অকুণ্ঠিত সাহস আর অটুট ধৈর্য্য। কারণ ইহার তিনটি ধাপ আমরা দেখিতে পাই। যখন শেষটিতে পৌঁছিয়াছি তখনই কেবল সাধনা আমাদের কণ্টকহীন ও দ্রুতগামী। প্রথম হইতেছে অহং এর চেষ্টা দিব্যভাগবত সেই বৃহৎ সেই পূর্ণের সংস্পর্শে আসিতে। ফলে তারপর আমাদের সমস্ত নীচের প্রকৃতিটিকে দিব্যপ্রেরণার সহায়ে তিল তিল করিয়া গড়িয়া তুলা এবং তাহাকে সমুচ্চ ভাগবত প্রকৃতিতেই পরিবর্ত্তিত করা। আর শেষ যখন এই পরিবর্ত্তন পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু পথ যতই দুর্গম হউক না কেন, এ পথে আমরা নিজের শক্তিতে চলি না। আমরা অহংকারকে দূর করিতে করিতে চলিয়াছি, তাই ভাগবতশক্তিই অলক্ষ্যে যবনিকার ভিতর হইতে প্রতিনিয়ত আমাদের দুর্ব্বলতার স্থান গ্রহণ করিতেছে, শ্রদ্ধা, সাহস বা ধৈর্য্যের অভাব যখন তখন ইহাই আমাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছে। এই শক্তি যে অন্ধকেও চক্ষুষ্মান্ করে, পঙ্গুকে দিয়াও গিরি উল্লঙ্ঘন করায়। বুদ্ধি সন্ধান পায় একটি বিধান বা বস্তুর অন্তর্নিহিত এক ধর্ম্ম যাহার অব্যর্থ গতিই হইতেছে ভদ্রকে কল্যাণকে ঘিরিয়া। হৃদয় খুঁজিয়া পায় একজন প্রভু, একজন সখা, অথবা এক বিশ্বমাতা যিনি প্রতি পদস্খলনে আমাদিগকে ধরিয়া উঠাইতেছেন। এ পথে যত বাধা যত বিপত্তি অন্য কোন পন্থায় তাহার কিছুই নাই বটে কিন্তু যখন স্মরণ করি ইহার লক্ষ্যটি,

ইহার প্রয়াসের বিপুলত্ব—মানুষের প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার সকল অঙ্গ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আর এক ধর্ম্মে তাহাকে জগতের জীবনের কর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত রাখা—তাহার তুলনায় তখন মনে হয় এ পথের মত সহজ পথ আর নাই, এমন অব্যর্থ সুনিশ্চিত পন্থাও আর নাই।

৯

পূর্ণযোগের কার্য্যপ্রণালী

আমাদের পরাপ্রকৃতি যখন আমাদের অপরাপ্রকৃতির উপর অখণ্ড ভাবে খেলিতে থাকে, আমাদের প্রাকৃতস্বভাবের সমস্তখানির মধ্যে যখন ভাগবত স্বভাব নামিয়া আসিতে থাকে, তখন উহা যে ভাবে যে প্রণালীতে কার্য্য করিতে থাকে তাহার তিনটি লক্ষণ আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। প্রথমতঃ দেখি সেখানে যথাবিহিত অকাট্য নিয়ম বা পরম্পরা কিছু নাই। বিশেষ বিশেষ যোগপ্রণালীতে আছে ধরাবাঁধা আইন, সাধক সেখানে চলিয়াছেন নিজেকে আঁটিয়া বাঁধিয়া, একটির পর একটি করিয়া স্তরের পর স্তর পার হইয়া। পূর্ণযোগের সাধক কিন্তু চলিয়াছেন একটা মুক্ত যথেচ্ছ-গতির মধ্য দিয়া। সাধনার শক্তি সেখানে কাজ করিতেছে বিক্ষিপ্তভাবে, কোন বিশেষ বিধানের মধ্যে তাহা নিঃশেষ ধরা দিতেছে না, তবুও সে শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, নিগূঢ়-ভাবে তাহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে করিতেই সে চলিয়াছে। সাধ-

কের ব্যক্তিগত প্রকৃতি, সে প্রকৃতির মধ্যে যে সব উপকরণ হই-তেছে শুদ্ধির সিদ্ধির সহায় আর যে সব অন্তরায় সেই সকল অনু-সারেই শক্তি নিয়মিত পরিচালিত হইতেছে। বিশেষ যোগের সাধকসকলকে চলিতে হইতেছে একই পথে একই ভঙ্গিমায়—সরলরেখায় ঋজুভাবে। পূর্ণযোগের সাধক নিজের অন্তঃস্থিত নিগূঢ় প্রয়োজনের বশে চলিয়াছে ঘুরিয়া ফিরিয়া, একটা উদার প্রসারের মধ্য দিয়া আপনার সমস্ত প্রকৃতিটিকে লীলায়িত বলয়িত হইয়া উঠিবার যথেষ্ট অবকাশ দিয়া। পূর্ণযোগের প্রত্যেক সাধ-কেরই স্বতন্ত্র পথ, প্রত্যেক সাধকই স্বভাবের প্রয়োজন অনুসারে নিজ নিজ সাধন উপায় সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া সকলের মধ্যে সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া যে কিছু নাই তাহা নয়। কোন কঠিন সঙ্কীর্ণ ছাঁচের মধ্যে না ঢালিয়া ফেলিয়া, আমরা পূর্ণযোগেরও কার্য্যে একটা প্রণালী ধরিয়া দিতে পারি, পূর্ণযোগেরও একটা শাস্ত্র কিছু পাইতে পারি। প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালীতে রহিয়াছে কেমন মুক্ত স্বচ্ছন্দ গতি, সেখানে নাই জড়যন্ত্রের অলঙ্ঘ্য গতানু-গতিকতা, পদ্ধতির বাধ্যবাধকতা—কিন্তু তবুও সেখানে আছে একটা নিয়ম একটা ধর্ম্ম, শুধু তাহা হইতেছে উদার সূক্ষ্ম, তাহা রহিয়াছে সকল প্রকার স্বাতন্ত্র্য স্বৈরাচারকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহা প্রাণের ধর্ম্ম। পূর্ণযোগের মধ্যে খেলিতেছে প্রকৃতির এই প্রাণের ধর্ম্ম।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ণযোগের কার্য্যপ্রণালী হইতেছে পূর্ণ অখণ্ড, সাধকের সমগ্র প্রকৃতিটি লইয়া। সুতরাং আমাদের সমস্ত অতী-

তের পরিণতিস্বরূপ আজ যে প্রকৃতির আধার আমরা হইয়া উঠিয়াছি, তাহার কোন প্রয়োজনীয় উপকরণই বর্জ্জিত হয় না, সবই কেবল পরিবর্ত্তিত হইয়া ভাগবত সত্তায় ভরিয়া উঠে। আমাদের মধ্যে প্রত্যেক জিনিষটিই এক মহাশিল্পী আপন হাতে করিয়া লন এবং বর্ত্তমানে অতি ক্ষীণ অস্পষ্টভাবে যে বস্তুটিকে সে প্রকাশিত করিতে চাহিতেছে, সেই বস্তুটিরই জ্বলন্ত মূর্ত্তি করিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলেন। আমাদের উপলব্ধি, আমাদের দৃষ্টি যতই স্পষ্টতর পূর্ণতর হইতে থাকে ততই আমরা বুঝিতে থাকি আমাদের নিম্নতর প্রকৃতি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আধার কোন্ কোন্ উপকরণে গঠিত, ততই দেখিতে থাকি উহার মধ্যে যত কিছুই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, হেয়, বিকৃত বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন সকলেরই মধ্যে নিগূঢ় রহিয়াছে একটা সত্য একটা ঋত দিব্য ভাগবত প্রকৃতির মহাসামঞ্জস্যে যাহার স্থান ও কর্ম্ম যথানির্দ্দিষ্ট আছে। মানব প্রকৃতির সকল স্তরের, আধারের প্রতি অঙ্গেরই আছে একটা সত্য আত্মা সত্য ধর্ম্ম সত্য কর্ম্ম সে সকলই ফুটাইয়া তুলিয়া, জাগ্রতে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্ণযোগ ভগবানের পূর্ণতা গড়িয়া লইতেছে।

তৃতীয়তঃ, পূর্ণযোগ আমাদের অন্তঃস্থিত ভাগবত শক্তি আমাদের সমগ্রজীবনটিকেই উপায় স্বরূপ কার্য্যে লাগাইয়াছে। আমাদের প্রত্যেক অভিজ্ঞতা, বাহ্যজগতের সহিত প্রত্যেক স্পর্শ যতই অকিঞ্চিৎকর অথবা যতই বিপুল মারাত্মক হউক না কেন সকলকে ধরিয়া কার্য্য করিয়া চলিয়াছে। অন্তরের প্রত্যেক অনুভূতি, প্রত্যেক মর্ম্মন্তুদ যাতনা, সাধনার পথে প্রতি পদস্খলনাও আমা-

দের সহায় হইয়াছে, সিদ্ধির দিকে অব্যর্থভাবে লইয়া চলিয়াছে। আমাদের চক্ষু খুলিয়া যায়, আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকি ভগবান্ জগতের মধ্যে যে প্রণালীতে কার্য্য করিতেছেন, আমাদের অন্তরেও ঠিক সেই প্রণালীই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। জগতে দেখি অন্ধকারের ভিতর হইতেই আলোক বাহির করিতেছেন, দুর্ব্বলের পতিতের মধ্যেও শক্তির অভ্যুত্থানের বীজ বপন করিতেছেন, যাহা দুঃখদায়ক যাহা কষ্টকর তাহাকেও আনন্দের উৎস করিয়া গড়িতেছেন। প্রাকৃত জগতে যাহা দেখি, আধ্যাত্মিক জগতেও দেখি সেই একই লীলাভঙ্গিমা। তবে প্রাকৃতজগতে শক্তি কার্য্য করিতেছে অতি ধীরে, অজ্ঞানতঃ আর অপরটিতে শক্তি ক্ষিপ্র জাগ্রত চেতনাময়, যন্ত্র যে সে চিনিয়াছে স্বীকার করিয়াছে যন্ত্রীকে প্রভুকে।

বিশ্বজীবনই হইতেছে প্রকৃতির যোগ। প্রকৃতির চেষ্টা আপনার মধ্যে নিগূঢ় ভগবানকে প্রকটিত করিবার জন্য। এই বিশ্বপ্রকৃতির আপনাহারা চেষ্টা মানুষের মধ্যে যখন সচেতন আত্মজ্ঞানে পূর্ণ হইয়া উঠে, আপন উদ্দেশ্যকে যথাযথ পরিপূর্ণ করিবার সামর্থ্য যখন তাহার জন্মায় তখনই আমরা প্রাকৃতিক স্তর হইতে উঠিয়া গিয়াছি আধ্যাত্মিক স্তরে, তখন প্রাকৃতিক শক্তির স্থানে আবির্ভূত হইয়াছে যোগশক্তি। প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি বিক্ষিপ্ত অনবরব স্তিমিতপ্রবাহ অথচ বিপুল সর্ব্বব্যাপী তাহাকেই সংহত সুবিন্যস্ত চক্ষুষ্মান্ করিয়া কার্য্য করিতেছে পূর্ণযোগশক্তি।

১০

পূর্ণযোগের ফল

পূর্ণযোগের সাধন-প্রণালীটি যেমন পূর্ণ অখণ্ড, তাহার ফলও তেমনি পূর্ণ অখণ্ড।

প্রথম হইতেছে ভাগবত সত্তার পূর্ণ অখণ্ড উপলব্ধি। ভগবানকে পূর্ণরূপে পাইয়াছি অর্থাৎ তাঁহার যে ভেদহীন অদ্বিতীয় একত্ব শুধু সেইটুকুই নয়, কিন্তু তাঁহার যে অনন্ত রূপবৈচিত্র্য তাহাও উপলব্ধি করিয়াছি—আত্মার মধ্যে যে একত্ব শুধু তাহা নয়, হৃদয়ঙ্গম করি আবার সেই একত্ব যাহা রহিয়াছে কর্ম্মের, সৃষ্টির, জীবসকলের নানাত্বের খেলায়।

আর সেইজন্যই পূর্ণ অখণ্ড মুক্তি। শুধু সাযুজ্য মুক্তি নয়—সাযুজ্য মুক্তিতে আত্মার ব্যক্তিগত সত্তা ভেদজ্ঞান দ্বন্দ্ববোধের মধ্যেও স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে ভাগবত সত্তাকে। শুধু সালোক্য মুক্তি নয়—সালোক্য মুক্তিতে আমার চেতনা রহিয়াছে জাগিয়া সেই ভাগবত লোকে, সচ্চিদানন্দের মধ্যে। কিন্তু পূর্ণযোগ দেয় আবার সাধর্ম্ম্য মুক্তি, অর্থাৎ যখন আমার ও ভগবানের একই ধর্ম্ম, আমার আধারের নিম্ন স্তরটি—তাহার সকল সত্তা, সকল কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপেই গড়িয়া উঠে, পরিচালিত হয় ভাগবত সত্তায় ভাগবত প্রেরণায়, ভগবানই ধারণ করেন মানুষী রূপ।

এই অখণ্ড উপলব্ধি আর এই অখণ্ড মুক্তির ফল জ্ঞানের প্রেমের কর্ম্মের পূর্ণ সামঞ্জস্য। কারণ তখন অহং জ্ঞান বিলুপ্ত

হইয়া গিয়াছে, তখন চেতনায় একীভূত হইয়াছি সকলের মধ্যে ও সকলকে ছাড়িয়া আছে যে এক তাহার সাথে। আর এই চেতনা এই জ্ঞান যখন খণ্ডিত নয় তখন ত সহজেই কৈবল্যের একত্বের আনন্দ যেমন উপভোগ করি, ঠিক তেমনি নানার বৈচিত্র্যের যে রস তাহাও উপভোগ করি। সত্তার সে নিগূঢ় সমুচ্চ প্রতিষ্ঠানে প্রেমময়ের সহিত যুক্ত হইয়া এ জগতেরই বহুবিধ সম্বন্ধের মধ্যে প্রেমানন্দের আসনটি প্রসারিত করি। আর জগতকে জীবনকে যখন এইভাবে আলিঙ্গন করিতে পারি, অন্তরাত্মায় যখন সেই উদার মুক্তি পাই যাহা জগৎ হইতে বিমুখ হওয়ার উপর নির্ভর করে না কিন্তু জগৎকে ধরিয়াই যাহা অব্যাহত রহিয়াছে তখন ত আমার দেহে মনে সেই ভাগবত-প্রেরণাস্রোতই বহিয়া চলে, জগতে আমার মধ্য দিয়া ভাগবত কর্ম্মই সম্পাদিত হইতে থাকে।

ভাগবত জীবন যাহা তাহা শুধু মুক্তিতে নয়, তাহাতে আছে আবার শুদ্ধি, ভুক্তি, সিদ্ধি। অখণ্ড শুদ্ধি একদিকে ভাগবত সত্তাটিকে সামাদের সত্তার মধ্যে পূর্ণ প্রতিফলিত করিয়া দেয় আর একদিকে সত্তার যে সত্য ধর্ম্ম সত্য কর্ম্ম—ঋত—তাহাকেও ফুটাইয়া তুলে আমার কর্ম্মজীবনের মধ্যে। যে জটিল যন্ত্র সমষ্টি লইয়া আমার আধার তাহা যতদিন শুদ্ধ না হইতেছে, যতদিন ভাগবত প্রেরণার প্রণালী না হইয়া উঠিতেছে ততদিন পূর্ণ মুক্তি নাই। আর এই শুদ্ধি যখন পাইয়াছি তখন পাইয়াছি পূর্ণ ভুক্তি—জগতের অতীতে যে আনন্দঘন তাহাও উপভোগ করি আর জগতে যত কিছু বস্তু সে সকলেরও রসভোগ করি সেই আনন্দস্বরূপের

প্রতীকরূপে বিগ্রহরূপে। আধার শুদ্ধ হইলে, তাহার স্তরে স্তরে ভাগবত আনন্দ প্রতিষ্ঠা হইলে, মানুষ হইয়া উঠে মানবধর্ম্মাবলম্বী ভগবান্—তাহাই সিদ্ধি। মানবের প্রকৃতিতে ভগবান্ তখন আবির্ভূত হন, তাহার সত্তায়, তাহার প্রেমে, তাহার আনন্দে, তাহার জ্ঞানে, তাহার কর্ম্মে প্রকটিত হন সেই ঈশ্বর যিনি যুগপৎ এক ও বহু, যিনি জ্ঞান ও শক্তি, যিনি সৎ ও তপঃ—মানুষ মানুষ হিসাবেই তখন পূর্ণ, সার্থক—কোন অংশকে, কোন অঙ্গকে, কোন প্রতিষ্ঠানকে বর্জ্জন করিয়া নয়, সকলকেই আলিঙ্গন করিয়া, আপন অখণ্ড সমগ্রতায় মানুষ তখন মহীয়ান্।

সিদ্ধির অর্থ আবার মনের সিদ্ধি ও শরীরের সিদ্ধি। সুতরাং রাজযোগের ও হঠযোগের যাহা ফল তাহাও রহিয়াছে পূর্ণযোগে। শুধু তাহাই নয়, মনের শরীরের পূর্ণ সিদ্ধিই দেয় পূর্ণযোগ, নতুবা সে যোগের পূর্ণতা নাই। তবে মনের ও শরীরের মধ্যে বিকশিত হইবে তাহাদের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। মনের জন্যই মন নয়, শরীরের জন্যই শরীর নয়—আত্মার ভগবানের জন্যই মন, আত্মার ভগবানের জন্যই দেহ। সুতরাং প্রাকৃতিক জগতে আমরা যে দেখিতে পাই তিনটি স্তর তিনটি প্রতিষ্ঠান বিকশিত হইয়াছে বা হইতেছে—স্থূল জগৎ, মানসিক জগৎ আর আধ্যাত্মিক জগৎ—পূর্ণযোগই তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছে। স্থূলজগৎ হইতেছে প্রতিষ্ঠা, ভিত্তিভূমি, মানসিক জগৎ হইতেছে করণ, যন্ত্র, প্রণালী আর আধ্যাত্মিক জগৎ সেই উৎস, সেই আদর্শ, সেই লক্ষ্য, সেই সাধ্য—যাহাকে এই অন্তঃকরণের, এই মধ্যবর্ত্তী

লোকের সহায়ে বাহিরে স্থূল জগতে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পূর্ণ-যোগ এই জগতে রহিয়া জগতেরই সকল কার্য্যে লিপ্ত হইয়া অতি-জগতের অধ্যাত্ম প্রতিভাটিকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া ধরিতেছে।

আর এই যে অখণ্ডতা পূর্ণতা তাহা বিশ্বমানবকে লইয়া। ব্যক্তির মধ্যে যদি শুধু উহা আবদ্ধ থাকে তবে তাহা প্রকৃত পূর্ণতা হইবে না, হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ যখন পূর্ণ ভগবানকে উপ-লব্ধি করিয়াছি, যখন সে ভগবান্ আমার ভিতরে যেমন বাহিরেও তেমনি, আমার নিজের মধ্যে যেমন আর সকল মানুষের মধ্যেও ঠিক তেমনি তখন নিজের পূর্ণতা নিজের সিদ্ধি সম্ভব সকলের পূর্ণতা সকলের সিদ্ধির মধ্য দিয়াই, বিশ্বমানবের সহিত যে একাত্মতা অনু-ভব করিতেছি, তাহা ত অব্যর্থভাবেই আমাকে চালাইয়া লইবে আমি যে অমৃতত্ব পাইয়াছি সকলকেই তাহার অধিকারী করিয়া তুলিতে। আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধির লক্ষ্য বিশ্বমানবেরই সিদ্ধি।

ইহাই পূর্ণযোগ—মানুষের যে স্থূলজীবন, ব্যক্তিহিসাবে জাতি-হিসাবে বিশ্বমানবহিসাবে তাহার যে ঐহিক প্রয়াস সে সম-স্তকেই দিব্যভাবে ভরিয়া দিতে হইবে, একটা বিরাট বিপুল আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ সকলকে অখণ্ড সামঞ্জস্যে বিধৃত পুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। এই মহান্ আয়াসই হইবে লক্ষ্য ও ফল সকল ব্যক্তিগত সকল সমষ্টিগত সাধনার।

আর ইহাই হইতেছে সেই অন্তরের স্বর্গরাজ্যের প্রতীকস্বরূপ বাহিরেরও স্বর্গরাজ্য, পৃথিবীতে সেই কৃতযুগ যাহা সকল দেশের সকল যুগের ঋষিগণ, কবিগণ, সাধকগণ কল্পনা করিয়া আসিয়া-

ছেন। আর আমরাও আজ এই নবীন যুগের সাধক, আমরা যাহারা দেখিতেছি ভগবান্ আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন জগৎ, মানব, মানবজাতিরই মধ্যে, আমরা এই কল্পনাকেই কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইয়াছি—ইহাই যে মানুষের একমাত্র যোগ্য সাধনা।
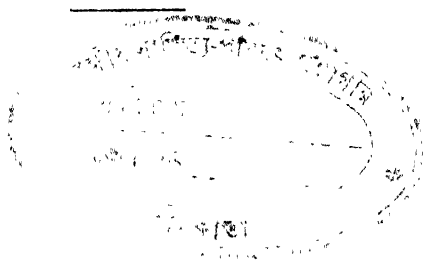
ভ্রম সংশোধন

২২পৃষ্ঠার ১৪লাইনে পরিচালিত স্থলে পরিচিত হইবে

অরবিন্দ বাবুর স্ত্রীকে লেখা ক'খানি

বিখ্যাত চিঠি

অরবিন্দের পত্র

"অন্যলোকে স্বদেশকে

একটা জড় পদার্থ, কত গুলা মাঠ ক্ষেত্র বন

পর্ব্বত নদী বলিয়া জানে

আমি মা বলিয়া জানি"

প্রভৃতি

হৃদয়ের সেই গোপন কথাগুলি

যা দৈবক্রমে প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল।

চিঠিগুলি যে-সব বিষয়ে

তা প্রত্যেকেরই জানা দরকার।

দু'খানি হাপটোন ছবি আছে

অরবিন্দ বাবুর ছবিখানি এখনকার

দাম চার আনা।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, চন্দননগর